ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

বিবিধ

দীনবন্ধু মিত্র

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী—১০

বিবিধ

দীনবন্ধু মিত্র

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য দুই টাকা

আষাঢ়, ১৩৫১

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৪—১৫. ৬. ৪৪

সূচী

গদ্য ঃ

পদ্য ঃ

বিবিধ—গদ্য

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদা নিদাঘকালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান্ মরীচিমালীর প্রখরকরনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোকময়, ফরাসিপ্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসি গালিচা বিস্তারিত, দেয়ালে নৈপুণ্যকুশল-শিল্পিশ্রেষ্ঠ ম্যাকেব-বিনির্ম্মিত ঘু ঘু ঘড়ী, কয়েকখানি সম্পূর্ণমূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর। কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ, কারণ কালান্তক মহোদয় এক দিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরেজি দশ ঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। আলেখ্যগুলি অতীব সুন্দর; বোধ হয়, অমরাবতীপ্রতিম লণ্ডন নগরের যাবতীয় নাট্যশালাললামভূতা মহিলাকুল যমালয়ের আলেখ্যে বিরাজিত; কলিকাতার কতিপয় মহানুভবের ফটোগ্রাফ দীপ্তিমান্ দেখা যাইতেছে। নিরয়াধিপতির পুরোভাগে অশীতি-হস্ত-পরিমাণ আশীবিষসদৃশ বক্রনলসঙ্কুল আলবলা, তাহার হিরণ্ময় মুখ, তদ্দ্বারা রাজমহলসমুদ্ভূত-তমাকনিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন, "অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি?" প্রধান মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য, পি, এণ্ড ও কোম্পানির ষ্টীমারে ভীয়া ব্রিণ্ডিসি একখানি সরকারী চিটি এবং সমীরণ যানে একখানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই 'জরুরি' শব্দাঙ্কিত।"

রাজার অনুমতি-অনুসারে মুন্সিপ্রবর সরকারী লিপিখানি অগ্রে পাঠ করিলেন, যথা—

"মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত
সংহারনিরত মুদ্গরহস্ত রাজাধিরাজ যমরাজ
মহোদয় অপ্রতিহতপ্রতাপেষু

অধীনের নিবেদন এই যে, শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় হইয়া সৈন্যবাহী সিন্ধুপোতে আরোহণপূর্ব্বক বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে কলিকাতা নগরে উপনীত হইলাম। কলিকাতার প্রায় সমুদায় লোক, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দীন, শিশু স্থবির, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন নবতি পারসেণ্ট আমার অমিততেজে অভিভূত। যে কয়েক জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে মদীয় শাসনাধীনে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। সম্পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বোধ করি, তাঁহাদের জন্য "কৃষ্ণ" দাদাকে প্রেরণের প্রয়োজন হইবে। কলিকাতার একজন যুবা পুরুষ মন্ত্রপূত শান্তিজলে আমার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন; আমি তাঁহাকে বাগে পাইলে ছাড়িব না।

কলিকাতায় সেনাপতিকে প্রতিনিধি রাখিয়া আমি সসৈন্যে দিগ্বিজয়াভিলাষে পরিভ্রমণ করিতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলের দুই পার্শ্বস্থ সমুদায় প্রদেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, অচিরাৎ অস্মদের শাসনাধীন হইবে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্বমেধের ঘোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইব, তজ্জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই। পঞ্জাবাধিপতি অজাতশত্রু রণজিৎ ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'রক্তবর্ণে চিত্রিতগুলিন কাহাদের অধিকার?' প্রত্যুত্তরে জানিলেন,

ইংরেজদিগের। তখন তিনি বলিলেন, 'সব লাল হো যাগা'—রণজিতের এতদ্ভবিষ্যদ্বাণী মদীয় দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ প্রযোক্তব্য।

যমালয়ের কারাগারে স্থানাভাব বলিয়া আপনার আদেশানুসারে বন্দী প্রেরণে বিরত রহিলাম। ইতি তারিখ ১৫ শ্রাবণ।

একান্তবশম্বদ
শ্রীডেংগুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।"

লিপির মর্ম্ম অবগত হইয়া কালান্তক হৃষ্টচিত্তে চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, "ডেংগুচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে, তাঁহার বীরকীর্ত্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অচিরাৎ উচিত পুরস্কার প্রেরিত হইবে। কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি অদ্যাপি ডেংগুচন্দ্রকে পূজা করে নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি তাহারা শীতাগমনের পূর্ব্বে ডেংগু মহাশয়ের পদানত না হয়, তবে "কৃষ্ণ" চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে। কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত দূর প্রদেশে গমন করিতে অনিচ্ছুক, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অগত্যা যাইতে হইবে।"

তদনন্তর মুন্সিপ্রবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন, যথা—

"দুষ্টদমন শিষ্টের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমরাজ
মহোদয় অখণ্ডপ্রবলপ্রতাপেষু

গতকল্য বেলা এক প্রহরের সময় বাগেরহাট সব-ডিবিজানের অন্তর্গত লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্য লাঠিয়াল, সুড়কিওয়ালা, গড়গোয়ালা, দেশোয়ালী জমায়েৎবস্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি লোক হত হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল এক জনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরী মহাশয়ের সদর নায়েব নব চাটুর্য্যে

একজন গড়গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘায় মাথাটি দোফাক হইয়া ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃত দেহ এমত গুপ্ত স্থানে লুকায়িত করিল যে, আপনার দূতেরা এবং আপনার প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিস্ ইন্স্পেক্টরের লোকেরা তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর বড় আটচালার পশ্চিম পার্শ্বের কাম্‌রায় একখানি দড়ি দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখানি একপাটায় ঢাকা আছে। যদি পত্র পাঠ দূত প্রেরণ করেন, নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল আপনার পুলিসস্থ ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিলাম। ইতি।”

যমরাজ দরখাস্ত শুনিয়া যারপরনাই উৎকলিকাকুল হইলেন। চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “হে মুন্সিশ্রেষ্ঠ, এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। না জানি, কি সর্ব্বনাশ আমার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্য জীবনশূন্য হইবামাত্র আমার অধীন; কিন্তু আশ্চর্য্য! ধূর্ত্ত জমীদার-কর্ম্মচারীরা দিবসদ্বয়পর্য্যন্ত অনায়াসে একজন প্রধান গণ্য ব্যক্তির মৃতদেহ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয় ডিপার্ট-মেণ্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনিলে আমাকে কি আর আস্ত রাখিবেন? এক সেট্ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের বলিয়া দেও যেন এই রজনীমধ্যে নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহটি আমার সমক্ষে আনয়ন করে—তাহারা যদি পিতা মহাশয়ের গাত্রোত্থান করিবার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে মদ খাইতে একটা বাঁধা আধুলি দিব।” আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র চিত্রগুপ্ত আটটি বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচালার পার্শ্বস্থ কক্ষে রামনাথ চৌধুরীর মৃত নায়েব রক্ষিত হওনের পর, পতনবাবুর কর্ম্মকারকেরা

জানিতে পারিলেন, তৎসংবাদ পুলিসের সব-ইন্‌স্পেক্টর জ্ঞাত হইয়াছে। তাহারা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লাসটি স্থানান্তরিত করিল, চারপায়াখানি খালি পড়িয়া রহিল।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে দুইটি তাম্র মাদুলি; ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে দড়কারোগ-সম্বন্ধীয় রেখাদ্বয় রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে; নাসিকাটি লম্বা; অল্প মঙ্গোলীয়ান কট্ বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর; গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে এক-বার করিয়া কেয়ারি করা হয়। গলায় সুবর্ণতারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বিচিসদৃশাক্ষমালা; বাহুতে ইষ্টকবচ, মধ্যভাগে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা, অঙ্গুলে একটি রজত একটি কাঞ্চন অঙ্গুরীয়; পরণে ময়ূরকণ্ঠ চেলির যোড়; পায়ে ফুলপুকুরে চটী। সর্ব্বাঙ্গে লোম; মস্তকের কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশালী উৎকুনকুল গাত্রলোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটি স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদূরদর্শিতাহেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারি দোরস্ত। কুড়রাম কিছু দিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটওয়ারিগিরি কর্ম্ম করিয়া একবারমাত্র নিকেশী দেনায় জমীদারদিগের চুণের গুদামে এবং বারত্রয়মাত্র সরকারি জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন।

রামনাথ চৌধুরীর নায়েবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওনের অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তি-দূর-মানসে তৎপরিত্যক্ত চারপায়াখানিতে আপনার বাক্সটি মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন। বাক্সটি বিষম বকেয়া, ডালার উপর আদ ইঞ্চি পরিমাণে ময়লা জমিয়া রহিয়াছে; বাম পার্শ্বে একটি ছিদ্র হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আরস্যুল্লা গমন করিয়া একখান কাণ-ফোঁড়া খাতা কাটিয়া ফেলে, ভবিষ্যদাক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য ছিদ্রটি গালা দ্বারা বদ্ধ করা হইয়াছে। বাক্সের জন্মাবধি কোন অংশে পেতলের সাজ নাই, পুরাকালে একখানি পেতলের মুখপাত ছিল, কিন্তু তাহাও বহু কাল হইল অপসৃত হইয়াছে। বাক্সের মুখপ্রান্তে একটি শ্বেত চন্দনের, একটি রক্ত চন্দনের, একটি হরিদ্রার অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রিত। বাক্সের ভিতরে নানাবিধ দ্রব্য—এক দিস্তা সাদা কাগচ, একটি কলম রাখা বাঁশের চোঙ্গা, তাহার মধ্যে তিনটি কঞ্চির কলম, একটি খাঁকের কলম, একটি শজারুর কাঁটা, একখানি লোহার বাঁটের ছুরি আর আদখানি কাঁচি, সাতখান কাণ-ফোঁড়া আর তিনখান খেরুয়া-মোড়া খাতা, একটি চুণের পুটলি, একখানি খাপ-খোলা আর একখানি খাপ-সংযুক্ত চসমা; একটি গলাসি দেওয়া কাচের দোয়াত ইত্যাদি। বাক্সটি একখানি মোটা সাদা গড়ায় খুঁটে খুঁটে গেরো দিয়া বাঁধা।

কুড়রাম অল্পকালমধ্যেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; তাললয়বিশুদ্ধ ফরর্-ফরর্-ফরাৎ ফরর্-ফরর্-ফরাৎ নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। যমরাজপ্রেরিত বাহকগণ এমত সময়ে আট-চালায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া চারপায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেই যমপুরে পদার্পণ করিল, আর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া

গেল। বৈতরণী নদীর তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয়
বেহারারা প্রাতঃক্রিয়া অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় দৃষ্টি রাখিয়া তোমার
উপক্রম করিতেছে, খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত
খট্টাঙ্গোপরি উঠিয়া বসিলেন, এবং নয় ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার
দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়া সম্পাদন হইবার
যমরাজের সৌধসমীপে ঝাউ গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছারিতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং গুমি করিয়া রাখিবে। কুড়রাম দেখিলেন, লাটিয়াল বা সুড়কিওয়ালা কেহই তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই, কেবল আট জন জীর্ণ বাহক আছে, তাহাদিগকে এক একটি চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং পলায়ন করিবার অতীব উপযুক্ত সময়। বেহারারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটি প্রচণ্ড চড় মারিয়া তর্জন গর্জ্জন সহকারে কহিলেন,—"ওরে নচ্ছার বেটারা, প্রাণে ভয় থাকে ত চারপায়ার নিকট আর আসিস না, আমি পতন বাবুর প্রধান পাটওয়ারি, আমি কি তোর রামনাথ চৌধুরীকে ভয় করি? এই দণ্ডে তোদের কাছারি বাড়ীতে আগুন দিয়া খাণ্ডবদাহন করিয়া যাইব। আমার প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়; এক প্রহরের মধ্যে তোদের মনিবের মুণ্ডপাত করিব।"

আট জন বেহারার মধ্যে তিন জন ভয়ঙ্কর সজীব চড়ের প্রভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বৈতরণী-নদী-গর্ভে পড়িয়া গেল, তিন জন কায়া-পরিবর্ত্তন করিয়া ডোমকাক হইয়া অন্তরীক্ষে কর্কশ কোলাহল করিতে লাগিল, এক জন ঊর্দ্ধশ্বাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, এক জন খট্টাঙ্গসমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কুড়রাম ভাবিলেন, "এ কি ভীষণ ব্যাপার! কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোমকাক হইল কেন?" বেহারা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া

২

রামনাথ চৌধুরীর নায়েবের মৃতদেহ স্থানান্তরি… নয়, এটা
অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তি-দূর-মানসে… …, তা ভুল করে
চারপায়াখানিতে আপনার বাক্সটি মস্তকে… না, আর মোরে …
বাক্সটি বিষম বকেয়া… জমিয়া রক্ষিবা।”

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাক্স খুলিয়া এক তক্তা কাগচ বাহির করিয়া একখানি পরোয়ানা লিখিলেন, এবং দুই বার তিন বার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাক্সটি দিয়া কহিলেন, “আমাকে যমরাজের সমক্ষে লইয়া চল।” বেহারা “যে আজ্ঞা” বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

প্রভাত-কার্য্য-সম্পাদন-করণানন্তর কৃতান্ত নিতান্ত উৎকলিকা-কুলচিত্তে বাহকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কুড়রামের চপেটাঘাতার্ত্ত বাহক অতিবেগে তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, “কর্ত্তামশাই, পেল্‌য়ে যাও, পেল্‌য়ে যাও, আর অক্ষে নেই, মাল্লে মাল্লে, বৈতর্ণীর ধারে একজন বীর এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত কর্‌বে, এক চড়ে আট্টা কাহার ঘাল করেছে।” চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “লাস্ আনিয়াছিস কি না?” বেহারা কহিল, “নব ঠাকুরকে কনে লুক্‌য়েচে তার অন্দি সন্দি পালাম না, মোদের কাঁদে একটা নতুন যম এসে পড়েছে।” যম জিজ্ঞাসা করিলেন, “নূতন যমকে পাঠালে কে?” বেহারা বলিল, “সে আপনি এয়েছে।” এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম তাঁহার বাক্স-বাহক সমভিব্যাহারে যমরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। চিত্রগুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন; যথা—

শ্রীদৌবারিক।

“ইজ্যতাছার শ্রীযমালয়াধিপতি
কৃতান্ত মালম করিবা

অপ্রকাশ নাই যে ইতিপূর্ব্বে তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, তুমি অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ; রণ্ডামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে; তোমার দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তুমি এমনি অকর্ম্মণ্য, জমীদারের কয়েক জন অল্পবেতনভোগী আমলা তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া তরফ ছানির নায়েবের মৃতদেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ানা প্রাপ্তি মাত্র অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত বাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।"

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া "হা হতোস্মি" বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দত্তজ মহাশয় কখন্ চার্য্য লইবেন?" দত্তজ উত্তর দিলেন, "এই দণ্ডে।" চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্য্যের কাগচ পত্র প্রস্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন; এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক পারিষদবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাত্র দোলাইতে দোলাইতে এবং স্ফূর্ত্তিবিস্ফারিতবদনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রতি একটি জমা-ওয়াশীল-বাকি প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। তখন পদচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েক দিনের বেতন এবং শাদাজ্বালানির দাম বাকি আছে, সেগুলিন প্রাপ্ত হইলে আমি রাহাখরচ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি এ বিষয় ভগবান্ ভবানী-পতিকে জানাইব, তিনি অনুমতি দিলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।" পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মরাজ, আস্তাবলে

যে বয়ারদ্বয় আছে, তাহার একটি সরকারি আর একটি আমার নিজ খরিদ ; যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটি আমি লইয়া যাই।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “তুমি দুটিই লইয়া যাও, আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায় চৌঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন করিব।” পুরাতন যম প্রস্থান করিলে নূতন যম সভা ভঙ্গ করিয়া সহর পরিদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন।

যমালয়ের বর্ত্ম সকল অতি অপরিসর এবং নিতান্ত অসমতল। ফেটান বা বেরুচ, আফিসযান বা ব্রাউনবেরি চলিবার উপযোগী নহে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মহিষারোহণে গমনাগমন করেন, সুতরাং রাস্তার অবস্থার প্রতি কাহারো দৃষ্টি ছিল না। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম ইঞ্জিনিয়ারদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনুমতি দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় রাস্তা পরিসর এবং সুমার্জ্জিত হইবে, অন্যথা ইঞ্জিনিয়ারবর্গের শিরশ্ছেদন করিবেন। চিত্রগুপ্ত কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ! রাস্তা চৌড়া করিতে গেলে অনেক বড়মানুষের বাড়ী পড়িবে, সে সমুদায়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একজন ডেপুটি-কালেক্টরের প্রয়োজন ; এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সর্‌ভেয়িং জানেন না।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “আমি সর্‌ভেয়িংপারদর্শী একজন ডেপুটিকে আনাইয়া দিতেছি।” যমালয়ের বিদ্যালয়টি দর্শন করিয়া কুড়রাম যারপরনাই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন ; কারণ, ছাত্রেরা জমা-ওয়াশীল-বাকি লিখিতে জানে না এবং কবিওয়ালাদের গীতও বাঁধিতে পারে না। তিনি এতদ্বিদ্যাদ্বয়োন্নতিসাধক দুইটি নূতন শ্রেণী স্থাপন করিলেন। সৈন্যশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ধনাগার, কারাগার, হাঁসপাতাল, পাগলা-গারদ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত

হইল। গাত্রলোম আর প্রত্যক্ষ হয় না; শিবের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; বৈতরণীতীরে ঋত্বিক্‌মণ্ডলী সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কুড়রাম রাজাট্টালিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রিদিবেশ্বরী শচী যেমন চিরজীবিনী এবং স্থিরযৌবনা, যমরাজ-রাজমহিষী কালিন্দীও সেইরূপ; তবে শচীর রূপ দেখিলে মনে আনন্দোদ্ভব হয়, কালিন্দীর রূপ দেখিলে হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়। যিনি যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহারি রাণী; যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালিন্দীও তখন তাহারি রাণী। কালিন্দী কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী, তাহার উদরপরিধি চতুর্দ্দশ গজ দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি; হস্তিমস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল এবং টিবিযুগলে বিভক্ত; সীমন্তে সাত হাত লম্বা, দুই হাত চৌড়া, আদ হাত উর্দ্ধ সিন্দূররেখা; ললাট এত প্রশস্ত, উপত্যকাধিত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত; নাসিকা নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ, তাহাতে একটি নৎ দুলিতেছে, নৎটি কুম্ভকারচক্রপরিমাণ মোটা, নোলকটি যেন একটি কলসী, মুক্তাদ্বয় দুটি সুপক্ক বিলাতি কুমড়াবিশেষ; দাঁতগুলিন দীর্ঘ এবং অতিশয় উচ্চ, ওষ্ঠ দ্বারা ঢাকা পড়ে না; জিহ্বাটি গোজিহ্বা, হাত দিলে কর্ কর্ করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে বলিবেন, কালিন্দীর জ্বর হইয়াছে; কালিন্দীর ত্বক্ মসৃণ নহে, হাতীর গায়ের মত খস্‌খসে। নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশবিন্যাস করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক শত বিরাশীখান শাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে একখানি চুনুরি শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আদ মণ সর্ষপতৈল ঢেউ খেলিতে লাগিল; প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে

মুখামৃতসহযোগে অভ্রখণ্ডসমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পদযুগলে বাইশগাছা মল। ঘু ঘু ঘড়ীতে ঘু ঘু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী অমনি বাম হস্তে পানের বাটা, দক্ষিণ হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণপূর্ব্বক ঝম্ ঝম্ করিয়া অপরিচিত স্বামিসন্নিধানে গমন করিলেন।

শয়নমন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, "যমালয় হইতে পলায়ন করিবার উপায় কি, জাল ধরা পড়িলে দ্বীপান্তর হইতে হইবে, পুরাতন যম আপিল করিলেই জাল বাহির হইয়া পড়িবে।" শয়নাগারে অস্লারের বাড়ীর ঝাড় জ্বলিতেছে! শয্যার নিকটে কয়েকখানি সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং চেয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আগমন করিয়া দাঁতগুলিন বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করিলেন। কুড়রাম কহিলেন, "কল্যাণি, তুমি কে?" কালিন্দী বলিল, "আমি যমরাজ-রাজ-মহিষী কালিন্দী, আপনার দাসী, ধর্ম্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।" কুড়রাম ভাবিলেন, "এই বারে গেলেম, যদ্যিও দুই এক দিন এখানে থাকিতাম, এ মূর্ত্তি দর্শনে আর থাকিতে পারি না; মহিষীর গায় গা ঠেকিলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে; কি কৌশলে ও রক্তবীজবিনাশিনীর ভীষণালিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই; গৃহিণীর জ্বালায় গৃহ ত্যাগ করিতে হইল; স্ত্রী অনেক অনর্থের মূল।" কালিন্দী কুড়রামকে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া কহিলেন, "প্রাণবল্লভ, আমি তোমা বই আর জানি না—

তুমি শ্যাম আমি প্যারী,
তুমি শুক আমি শারী,
তুমি ষাঁড় আমি গাই,
তুমি হাতা আমি ছাই,

তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ী,
তুমি ঘোড়া আমি গাড়ী,
তুমি বোল্‌তা আমি চাক্,
তুমি ঢাকী আমি ঢাক,
তুমি পোকা আমি ফুল,
তুমি কর্ণ আমি দুল,
তুমি ছাগ আমি ছাগী,
তুমি মিন্সে আমি মাগী,
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলি,
তুমি বাঁশ আমি ডুলি,
তুমি ডালা আমি ডালী,
তুমি শালা আমি শালী।”

রাজ্ঞীর মুখভঙ্গিমায় কুড়রামের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল, বক্ষাভ্যন্তরে দড়াশ দড়াশ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেন, “শোভনে! তোমার বচনপীযূষে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, শতাশ্বমেধ-যজ্ঞ-ফলে তোমা হেন স্থূলোদরা দারানিধি প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু হরিষে-বিষাদ। আমার গণীভূত যক্ষ্মাকাশ আছে, সেন মহাশয় এতদবস্থায় সহধর্ম্মিণী-সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব হে চারুহাসিনি, দিবসত্রয় তোমার ভৃত্যকে অবসর দিতে হইবে।” কালিন্দী একটি পানের খিলি কুড়রামের মুখে দিয়া বিষাদিতমনে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। খিলিটি চর্ব্বণ করিবামাত্র হড় হড় করিয়া কুড়রামের অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল। ভাঁটপাতা, নিম, মাচের আঁশ, কুইনাইন রাজ-মহিষীর প্রিয় পানের মসলা; স্বামিবশীভূত-করণাশায় যত পারিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া খিলিতে দিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ

কুড়রাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রমদাপ্রদত্ত পানের খিলি আর না খুলিয়া খাইবেন না। কুড়রাম নিদ্রা গেলেন। স্ত্রীর মুখ মনে পড়াতে তিন বার ডরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদচ্যুত যম বিষণ্নবদনে ভবনে প্রবেশ করিয়া জননীকে সমুদায় পরিচয় দিলেন। যমরাজ-জননী যারপরনাই দুঃখিত হইলেন; নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। কাতর স্বরে কহিলেন, "বাবা যম, এ দুর্ভিক্ষসময়ে তোমার কর্ম্মটি গেল, এ রাবণের পুরী কি প্রকারে প্রতিপালন করিবে। তুমি আহার কর, তার পরে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকটে যাইব, লক্ষ্মীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। আজ কাল অঞ্চলপ্রভাব অতীব প্রবল।" যমরাজ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু বসা মাত্র, একটি ভাতও মুখে দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কত সাহস দিতে লাগিলেন; কহিলেন, "ভয় কি বাবা, তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার এত কালের কর্ম্ম কখনই একবারে ছাড়াইয়া দিবে না। বিশেষ, লক্ষ্মী ঠাকুরুণ অনুরোধ করিলে কেহই বক্রভাব প্রকাশ করিবেন না। আর যদি একান্তই কর্ম্ম যায়, বৈদ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে; তোমার হাতযশ সকলেই অবগত আছেন, আর আমি অনেক শিল্পকার্য্য জানি, জুতা, টুপি মোজা বিনাইয়া তোমায় সাহায্য করিব।" জননীর সাহস-বাক্যে যমরাজের দুর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বরে ভোজন সমাপন করিয়া

উড়ানিখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলিলেন, ঠনঠনের জুতা যোড়াটি পায় দিলেন, তার পরে একগাছ বাঁশের লাঠি হস্তে করিয়া জননীর সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

দিবাবসান। লক্ষ্মী নিজ কক্ষে অবস্থান করিতেছেন, স্বভাবতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, অঙ্গে অলঙ্কার দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবন্ধে দুগাছি হীরকবলয়, পায়ে চারগাছি জলতরঙ্গ মল, নিতম্বে একছড়া মোটা সোণার গোট, কণ্ঠে দুনর মুক্তামালা, মস্তকে সজলজলদরুচি উজ্জ্বল কেশদামে ফিরেঙ্গি খোঁপা বাঁধা, কর্ণে কাঁচপোকা-দুল-তুল্য দোদুল্য নীল পান্না। ছাঁচি পানে সুমধুর অধর হিঙ্গুলের ন্যায় টুক টুক করিতেছে। একখানি রেলওয়ে পেড়ে সিমলার ধোপদাস্ত ফিন্‌ফিনে ধুতি পরিধান, তাহার স্বচ্ছতা নিবন্ধন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের আভা বাহির হইতেছে। লক্ষ্মী দুর্গেশনন্দিনী অধ্যয়ন করিতেছিলেন, অধীয়মান পত্রে প্রদর্শনী প্রদানপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুড়িয়া আয়েষার বিষাদ আলোচনা করিতেছেন ; এমত সময় যমরাজ-জননী সমুপস্থিত হইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজ-জননী আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "মা, আপনি ত্রিলোকপ্রতিপালিনী ; আমার যমের প্রতি একটু দয়া করুন, যম আমার এক দিনের মধ্যে আদখানি হইয়া গিয়াছে।" লক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা, যমের কর্ম্ম গিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অনুরোধ শোনেন না ; তা বাছা, তুমি আর রোদন করিও না, আমি ঠাকুরকে বলিয়া যত দূর পারি, তোমার উপকার করিব।" যমরাজ-জননী লক্ষ্মীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা, আপনার ধনে

পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক, মা, আপনি মনে করিলে সকলি করিতে পারেন, আপনি বিষ্ণু ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন। মা, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন বাঁচিব না, যে ক'দিন বাঁচি, আপনার কৃপায় যেন কষ্ট না পাই।" লক্ষ্মী কহিলেন, "বাছা, আমায় অধিক বলিতে হইবে না, তোমার দুঃখে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।" যমরাজ-জননী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী পরিচারিকাকে কহিলেন, "বিন্দি, ঠাকুরকে একবার বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

বিষ্ণু সম্প্রতি একটি গরুড়ের জুড়ি কিনিয়াছিলেন; পক্ষিদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণে অতিশয় ব্যস্ত, একবার "ওহো বেটা, ওহো ও বেটা" বলিয়া গাত্রে হস্তবিক্ষেপ করিতেছেন, একবার কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা ঠোঁট মুছাইয়া দিতেছেন, একবার তাহাদের বক্র গ্রীবা অবলোকন করিতেছেন; এমত সময়ে বিন্দী আসিয়া উপর আদালতের সমন সর্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অতিশয় গরুড়-প্রিয়, ওয়ারেণ্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দীর অনুগামিনী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করত নারায়ণীর নবচম্পকদামসম চিবুকে একটি আদরগর্ভ টোকা মারিয়া কহিলেন, "আসামি হাজির, দণ্ডবিধান করুন।" নারায়ণী প্রণয়পূর্ণরোষকষায়িত-লোচনে বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অপ্রতিভ করা হয়।" বিষ্ণু কহিলেন, "এখন তোমার প্রার্থনা কি?"

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু। কি ভিক্ষা?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়াছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য নূতন পাইয়াছ।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নাম কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলাম।

তখন লক্ষ্মী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "সদাশিব যমের কর্ম্ম ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটি তাহাকে পুনর্ব্বার দিতে হইবে, যমের মা এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাঁদিতেছিল। আহা! বুড়মাগীর দুঃখ দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহার কর্ম্ম তাহাকে পুনর্ব্বার দিব।" বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, সদাশিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে সভার বিনা অনুমোদনে যমকে পদচ্যুত করিলেন। যাহা হউক, যখন তুমি তাহার ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিয়াছ, তখন সে কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে; আমি অবিলম্বে ব্রহ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব। বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য এমত কড়া হুকুম দিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহার পদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" লক্ষ্মীর অলককুন্তলে একটি দোল দিয়া বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর অভিমতানুসারে কোচম্যান বিস্মার্ক ব্রাউভার্ণর ফিটানে নূতন গরুড়ের জুড়ি যোজনা করিলে নারায়ণ

আরোহণপূর্ব্বক পদ্মযোনির সপ্তসরোবরোদ্যানে যাইতে কহিলেন। ব্রহ্মা গ্রীষ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। যম পদচ্যুতি পরোয়ানাখানি নারায়ণের হস্তে দিয়া কোচবক্সে উঠিয়া বসিলেন। ঘর ঘর করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল এবং নারায়ণ পরোয়ানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের স্বাক্ষরের প্রতি তাঁহার এক বার সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু গাঁজা টানিয়া সহি করিয়াছেন বিবেচনায় সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়ীও সপ্তসরোবরোদ্যানে পৌঁছিল।

সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকর-সম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিলেন। সংশোধনে এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু ব্রহ্মার তদবস্থা দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ শব্দে বলিলেন, "মহাশয়, প্রণাম হই।" ব্রহ্মা তখন মুখোত্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং সম্মান-সহকারে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবাজি যে অসময় ?" বিষ্ণু কহিলেন, "বিশেষ কার্য্যানুরোধ ব্যতীত মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আপনার বেদের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইবার বিলম্ব কি ? আপনি বেদ লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ভয় হয়।" ব্রহ্মা কহিলেন, "সে কি বাবাজি, আমি আপনার আশ্রিত, আপনার ভবন, আপনার উদ্যান, আমিও আপনার, যখন মনে করিবেন, তখনই আসিবেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। বোধ করি, আগামী শীতের প্রারম্ভেই চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইবে।" বিষ্ণুর পশ্চাৎ যমকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "অকালে কালের আগমন ;

অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে, যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে না কি?” বিষ্ণু কহিলেন, “যমরাজ মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত, সদাশিব যমকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এই পরোয়ানাখানি পাঠ করুন।” ব্রহ্মা পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া বলিলেন, “যমের এ বিপদ্ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর হইল, যম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সম্যক্ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, উনি এমনি ভীরু যে পরস্ত্রীকাতর দুর্দ্দান্ত নরাধমদিগের নিকটে যাইতেন না, কেবল নিরপরাধ মধুরস্বভাব মহোদয়গণকে নিহত করিয়াছেন। কৃতান্তের যে কার্য্যশৈথিল্য, সদাশিবের ত দোষ দিতে পারি না, তিনি উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন।” বিষ্ণু কহিলেন, “যম আপনার সন্তান, সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়। যম আপনার নিতান্তানুগত, বহুকালের চাকর, উহাকে একবারে পদচ্যুত করা বিচারসংগত হয় না।” যমরাজ করযোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, “ভগবন্ চতুর্ম্মুখ, সন্তানকে একবার মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন আমাকে কর্ম্মে অমনোযোগী দেখিতে পাইবেন না।” ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বাবাজীর অভিপ্রায় কি?” দয়াপয়োধি সহৃদয় হৃষীকেশ উত্তর দিলেন, “মার্জ্জনা করা।” ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর মতে অকপটচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে সেই দণ্ডেই মহেশ্বর-ভবনে যাইবার জন্য বিষ্ণু অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, “ফিটান প্রস্তুত আছে, পাঁচ মিনিটে যাইবে, পাঁচ মিনিটে আসিবে।” ব্রহ্মা কহিলেন, “বাবাজি, অদ্য বেলাবসান হইয়াছে, গমন প্রত্যাগমনে রাত্রি হইবে; বিশেষ, সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার। আপনার ত অবিদিত কিছুই

নাই, অতএব যমকে অন্য বাড়ী যাইতে বলুন, কল্য প্রভাতে আট্‌টা না বাজিতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন করিব, আপনি যমকে লইয়া সেই সময় সেখানে যাইবেন।” যম ব্রহ্মা-বিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, “বাবাজি, আহার না করিয়া যাইতে পারিবেন না, শচীনাথ টড্‌হিট্‌লির পোর্ট পাঠাইয়াছেন, তোমার অনাগমনে তাহা খোলা হয় নাই।” ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোজনাগারে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে আট্‌টা বাজিবার পাঁচ মিনিট বাকি আছে, মহাদেব স্বীয় কক্ষাভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ শার্দ্দূলচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট; দুই হস্তে কমণ্ডলু ধরিয়া গরম চা খাইতেছেন। ভগবতী পার্শ্বে বিরাজিত। শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার করশাখা দ্বারা শশাঙ্কশেখরের পৃষ্ঠদেশের ঘামাচি মারিতেছেন। গত রজনীতে শূলপাণি সিদ্ধি খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিদ্ধি শিবের মৌতাত, তবে অচেতন, ইহার কারণ কি? নন্দী নূতন বাজারে গাঁজা কিনিতে আসিয়া শুনিয়াছিলেন, ব্রাণ্ডীতে নেসা না হইলে মরফিয়া মিশাইয়া দিতে হয় এবং সিদ্ধিতে নেসা না হইলে ঝুল মিশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব সিদ্ধিতে নেসা হয় না বলিয়া নন্দীকে সর্ব্বদাই ভৎর্সনা করেন। গত নিশিতে নন্দী ষাঁড়ের ঘর হইতে কতকটা ঝুল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাতেই ধূর্জটির ঘোরতর নেসা হয়। নেসার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ “ব্রেভো নন্দী” বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন নেসা পাকিয়া আইল, অমনি অম্বিকার অঙ্গে ঢলে পড়িলেন। বমন প্রবাহে শয্যা ভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন। পার্ব্বতী পতিপ্রাণা এবং ঘৃণাশীলা; অবিলম্বে কলুষিত শয্যা স্থানান্তরিত

করিয়া অভিনব শয্যা রচনাপূর্ব্বক স্পন্দহীন পিনাকপাণিকে স্থাপন করিলেন, এবং খিড়্কির পুষ্করিণীতে আপনার অঙ্গটি আপাদমস্তক গস্‌নেলের সাবান দিয়া ধৌত করিয়া আইলেন। গৃহে আসিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তবু যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; গাত্রে ল্যাভেণ্ডার সিঞ্চন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবৎ নিপতিত, নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, "ভগবতি, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পাচিকাকে বল, সকালে সকালে আমাকে মৌরলা মাছের ঝোল দিয়া চারটি ভাত দেয়।" ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কি না সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে আসি।" মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী, আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনতমুখী হইলেন; শিব কহিলেন, "ব্রহ্মা, আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম, আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া দুটো কথা বলুন।" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিলেন, "অভয়ার অভিমান হইল কিসে?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "গত রাত্রিতে সিদ্ধি-রস্ত-অ-আ হইয়াছিল, সুতরাং অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ও তো আপনার সাপ্তাহিক রঙ্গ, কিন্তু সুশীলা শৈলবালা সে জন্য ত কখন অভিমান করেন না।" মহাদেব কহিলেন, "বাবা, হাসির মার বড় মার, অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত ঘা কত প্রদান কর,

দেনা লহনা সমান হইয়া যাউক, তাহা না করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতে হয়।” ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবতী বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি ওঁর কথায় কর্ণপাত করিবেন না, উনি অষ্টপ্রহর আমার সহিত ঐরূপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ওঁয়ার চরণসেবার দাসী, আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি?” মহাদেব কহিলেন, “না হে চতুর্ম্মুখ, অন্নদা আমার জটের উঁকুন, সতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছেন।” ভগবতী কহিলেন, “তবে নখরে নখরে নিপাত কর, যমের বাড়ী চলে যাই।” বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, “ভগবতি, তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত, যাহার কাছে ইচ্ছা তাহার কাছে যাও।” ভগবতী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব যমকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “যম এমন ম্রিয়মাণ কেন?” ব্রহ্মা কহিলেন, “আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তরু শুষ্ক হইল কেন? যম আমাদের অতিশয় অনুগত, উহাকে আপনার মার্জ্জনা করিতে হইবে, আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না, যম সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী; আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎসাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। আপনার অনুজ্ঞা অস্মদাদির নিকটে অখণ্ড্য বলিয়া পরিগণিত; আপনার ক্রোধ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণকাল স্থায়ী, আপনার দয়া মরুন্নিভ চিরপ্রবাহিত; অতএব হে বদান্যতা-বারাংনিধি, বগলাবল্লভ, অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।”

ব্রহ্মার বচনে মহাদেব অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম্ম করি না। আপনি এতক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম হইয়া থাকিবে। আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে বস্তুত্রয়মাত্র সমুদ্ভূত হয়—তৈলাক্ত নাসিকা, নিদ্রা, এবং প্রস্রাব হয়, কিন্তু অদ্য জানিলাম, একটি চতুর্থ উপসর্গ হইয়া থাকে, সেটি প্রলাপ। আমি যমের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন স্পর্শ করি নাই, আপনি কহিতেছেন, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। কোন্ দিন বলিবেন, আমি ত্রিদিবাধিপতিকে দ্বীপান্তর করিয়াছি।" ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ "সদাশিব" স্বাক্ষরিত পরোয়ানাখানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব পরোয়ানাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, "এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরটি আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে। যমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।" যমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চার্য্য বুঝাইয়া দিয়াছ?" যম উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, অসুরেরা এ কাণ্ড করিয়া থাকিবে, অনেক কাল দেবাসুরে যুদ্ধ হয় নাই, এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এই দণ্ডে দণ্ডধর-নিকেতনে গমন করিতে হইবে।" বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল যম, কুড়রামের সমভিব্যাহারে সৈন্য সামন্ত কত আসিয়াছে?" যম উত্তর দিলেন, "জনপ্রাণী না,

কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র, আপনি কৃষ্ণাবতারে কংশালয়ে হাতে মাতা কাটিয়াছিলেন, কুড়রাম চপেটাঘাতে কয়েক জন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।” ব্রহ্মা কহিলেন, “শচীনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।” বিষ্ণুর মতে বহ্বারম্ভ অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু তাঁহার প্রতীতি হইতেছে যে, কোন আমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদা-রকম দেখিয়া যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিল এবং অচিরাৎ স্পেসিয়াল ট্রেনে যমের সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিলেন।

পারিষদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কুড়রাম সিংহাসনে উপবিষ্ট। চিত্রগুপ্ত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ, যমালয়ের কারাগারগুলিন প্রশস্ত না করিলে বন্দিগণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, যেরূপ লোক আসিতেছে, বোধ হয় দুটি কারাগার করিবার আবশ্যক হইবে।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “এমন উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্দারা কারাগার প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে। তুমি ত্বরায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শৃঙ্খল দ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখ, এক মাসের মধ্যে দেখিবে, কারাগার অর্দ্ধেক শূন্য পড়িয়া আছে।” চিত্রগুপ্ত সঙ্কুচিতচিত্তে কুড়রামকে জানাইলেন যে, অকালমৃত্যু পুরাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা হইতে সে নিযুক্ত, তাহার কারাবাসানুজ্ঞা আপিলে খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা। চিত্রগুপ্তের বচনে কুড়রাম অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল এবং বাক্সের উপর সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, “আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল, তোমাকে যে হুকুম দিতেছি, তুমি তাহা তামিল কর, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।”

কুড়রাম কম্পিতহস্তে রায় লিখিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে?" কুড়রাম উত্তর দিলেন, "প্রভো, আমি লোচনপুর-কাছারির আটচালায় শয়ন করিয়া ছিলাম, যম-প্রেরিত বাহকগণ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিল। আমি এখানে পৌঁছিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, সহায় সম্পত্তি হীন, কি করি, অবশেষে কাগচ কলম লইয়া একখানি পরোয়ানা দ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম। আত্মপক্ষ-সমর্থনে হুজুরের নামটি জাল করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; বিশেষ 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং' ধ্যান করিতে করিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্কশেখর নীলকণ্ঠ! দক্ষযজ্ঞবিনাশন-মার্জ্জনীয়মহেশ্বর! অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বাপু কুড়রাম, জাল করা অতি গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বীপান্তর-স্বরূপ তোমাকে লোচনপুরের কাছারি-বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিই।"

মহাদেব যমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকি করিতে! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কারখানাটা দেখিলে তো? নাকে কাণে খত দাও, আর কখন জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না। যমকে ভৎর্সনা করিয়া

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুড়রাম নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছারি-বাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চার-পায়ার উপর শয়ন করিয়া আছেন।

['বঙ্গদর্শন', কার্ত্তিক ১২৭৯]

পোড়ামহেশ্বর

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাগদা ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে পোড়ামহেশ্বর-দর্শনাভিলাষী পথিকের অভিলাষ সফল হয়। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গণ্ডগ্রাম আছে; সে গ্রামখানির নাম ভট্টাচার্য্য-কামালপুর। বহুকালাবধি কামালপুর অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত-পটলের আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞ অধ্যাপক অতি বিরল; বোধ হয়, বিদ্যাবিশারদ বনমালী বিদ্যাসাগর সহোদয়ের সহিত বীণাপাণির পরলোক হইয়াছে।

পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে কামালপুর গ্রাম ক্রোশত্রয় পশ্চাতে পতিত হইলে, খলসির বিল নামে একটি সুদীর্ঘ রমণীয় জলাশয় লোচন-পথে পতিত হয়। খলসির বিলের বারি যারপরনাই পরিপাটি; একবার তাহা পান করিলে তাহার শীতলতা, নির্ম্মলতা এবং মধুরতা কস্মিন্ কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কাচের গেলাসে সে সুবিমল নীর রাখিলে গেলাস শূন্য কিংবা পূর্ণ সহসা বলা কঠিন, কলিকাতার কলের জল অপেক্ষাও সে জল স্বাদু, গলাজলে মুদ্রা ফেলিয়া দিলে সুস্থির জলে সে মুদ্রা দৃষ্টিগোচর হয়। কুন্দ, কুমুদ, কহ্লার, কুবলয়, কমলসমূহে জলাশয়টি অতিসুন্দররূপে বিভূষিত। এত পদ্ম এক স্থানে সচরাচর দেখা দুর্লভ! জলাশয়ের কিয়দংশ সম্যক্ পদ্মপত্রে আবৃত, সেখানে বোধ হয় পদ্মপত্রবিরচিত একখানি প্রশস্ত বসন বিস্তারিত রহিয়াছে। উপকূলের অতি মনোহর শোভা; নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত, বৈকালে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবার সময় তদুপরি উপবেশন করিলে জলকুসুম-সৌরভামোদিত

শীতল অনিল শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; নিকটস্থ গ্রামের বালকেরা প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় উপনীত হইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলায় মত্ত হয়। জলাশয়ে নানারূপ পক্ষী সঞ্চরণ করে; তাহাদিগকে নিধনকরণাভিলাষে সময়ে সময়ে কিরাতস্বভাব আমোদপ্রিয় মহোদয়গণকে বন্দুক-হস্তে উপকূলে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

খলসির বিলের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে সরাবপুর গ্রাম; অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েক ঘর মুসলমান এবং কয়েক ঘর গোয়ালা মাত্র গ্রামের বাসিন্দা লোক।

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়ামহেশ্বর বিরাজিত। পূর্ব্বকালে একটি সুদীর্ঘ মন্দির ছিল; তন্মধ্যে পোড়ামহেশ্বর অবস্থান করিতেন। এক্ষণে মন্দিরের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির সম্যক্ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দিরের ইষ্টক এবং মৃত্তিকা স্তূপাকারে নিপতিত, দেখিলে বোধ হয় একটা ক্ষুদ্র পাহাড়; এই স্তূপোপরি পোড়ামহেশ্বর যেন পাতাল ভেদ করিয়া মস্তক উচ্চ করিয়া রহিয়াছেন। পোড়ামহেশ্বর-প্রস্তরে বিনির্ম্মিত; হস্তপদ কিংবা অন্য অবয়ব কিছুই নাই, একখানি শিলাস্তম্ভ মাত্র, উপরিভাগটি বর্ত্তুলবৎ। পোড়ামহেশ্বরের সমুদায় শরীর মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন, কেবল তিন হাত মাত্র বাহিরে আছে। সরাবপুরের লোকেরা বলেন, মহাদেবের অঙ্গ পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা সহসা প্রতীত হয়। যেহেতু শিবের মস্তক ধরিয়া লড়াইলে শিবের শরীর ঢক্ ঢক্ করিয়া লড়িতে থাকে। পোড়ামহেশ্বরের কলেবর পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হউক, কলেবরটি যে বৃহৎ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পোড়া-মহেশ্বরের মস্তকের এক পার্শ্বের কতকটা প্রস্তর চটিয়া গিয়াছে।

কিরূপে মস্তকের প্রস্তর চটিয়া গেল তাহার বিবরণ অতি মনোহর।

কিম্বদন্তী,—পোড়ামহেশ্বরের মস্তকাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল। কেহই জানিতেন না এবং কাঁহারও জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না যে, এমন অমূল্য দেবদুর্লভ রত্ন শশাঙ্কশেখরের শিরোদেশে বিরাজিত। বহুকাল হইতে একজন সন্ন্যাসী যোগবলে অবগত হইলেন, এই মহাদেবের মস্তকের মধ্যে স্পার্শ-মণি আছে, এবং অবিলম্বে সরাবপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্দিরের সম্মুখে অশথবৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী অতি দীর্ঘকলেবর; প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় রূপ; শ্বেত কুন্তল এবং শ্মশ্রুরাজি মুখমণ্ডল একেবারে আবরণ করিয়াছে; পৃষ্ঠদেশে জটাপুঞ্জ বিলম্বিত; দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়-দণ্ড; গাত্রে গাছের বল্কল। সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সঞ্চালন পর্য্যন্ত করেন না, দিবা বিভাবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে, রবশূন্য-বদনে, অবিচলিতচিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন। কৃষকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবেচনা করে, স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি কৈলাসধাম হইতে অবতরণ করিয়া পৃথ্বীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাখালেরা তাঁহাকে দেখিয়া বিবেচনা করে, একটি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদৈত্য। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী যমের দূত, জীবধ্বংসে প্রেরিত।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে সন্ন্যাসি-সম্বন্ধে নানা-রূপ অদ্ভুত কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। সুমিত্রা গোয়ালিনী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছে—সুমিত্রা মিথ্যা কহিবার লোক নয়—সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর ঘাট হইতে দুইটি কাঁচা মড়া আনয়ন করিয়া

ভক্ষণ করিতেছে। শবদ্বয় সমুদায় উদরস্থ করিয়া চুলগুলি তেমাতা পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সুমিত্রা ঐ চুল অজ্ঞাতসারে পদ দ্বারা স্পর্শ করে। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার কক্ষস্থ দুগ্ধ রুধির হইয়া প্রস্রবণরূপে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, পরিধেয় বসনখানি রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। দৈববলে শোণিতসিক্ত বসনের অলৌকিক গুণ জন্মিল; সুমিত্রা এই বসন পরিধান করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাতেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গোয়ালিনী ঘোল বিক্রয় করিতে যায়, লোকে দুদ বলিয়া গ্রহণ করে; গোয়ালিনী গরুর বাঁট ধোয়া নিরবচ্ছিন্ন কলসী কলসী জল দুদ বলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, পাড়ার গিন্নীরা বলেন, সুমিত্রার দুদ যেন বটের আটা। রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিতা সুমিত্রা যাহা যাচ্ঞা করে, তাহাই লাভ করে। আম্র-বৃক্ষের নিকট কাঁটাল চাহিল, আম্রবৃক্ষ রক্তবস্ত্রের ভয়ে স্বভাব অতিক্রম করিয়া কাঁটাল দিল; ভ্রমরার বিলে বাচ্ হইতেছে,—শত শত লোক নৌকা, ডোঙ্গা, জাল, পলো, ঘুঁড়ে, ঘুনি লইয়া মাচ ধরিতেছে, একটি আঁশমাত্র কাহারও ভাগ্যে সংগ্রহ হইল না, সুমিত্রা রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিলের উপকূলে দণ্ডায়মানা হইল, অমনি রুই, মিরগেল, কাতলা, কালবোস, শোল, বোল, বান, লাঠা লম্ফ দিয়া ডেঙ্গায় আসিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইল; অনাবৃষ্টিতে সৃষ্টিনাশ হয়, ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া ফুটির মত ফাটিয়া যাইতেছে, জল জল করিয়া কৃষকগণের জীবন ওষ্ঠাগত, পালা লতা পাতা পুড়ে ঝাঁই, এক দিন কিংবা দুই দিন এরূপ থাকিলে প্রলয় উপস্থিত হইবে, সুমিত্রা রুধিরাক্তাম্বরে আবৃতা হইয়া মধুরস্বরে "ফটিক জল, ফটিক জল" বলিয়া আকাশকে সম্ভাষণ করিল, অমনি মুষলধারে বারি বর্ষিতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্করিণী খাল বিল ডোবা খানা খন্দ জলে পরিপূর্ণ; চিরবন্ধ্যা

বামলোচনা বাষ্পবারি-বিগলিত-লোচনে পরিশূন্য-হৃদয়ে সন্তান-সন্তান করিয়া অহর্নিশি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রোদন করিতেছে, শোণিতার্দ্রবসনধারিণী সুমিত্রা সগৌরবে বলিলেন, "হতভাগিনি বন্ধ্যে, অচিরাৎ পুত্রবতী হও," সেই মুহূর্ত্তে বন্ধ্যার প্রসব-বেদনা ; জামাতা তনয়াকে ভালবাসে না ; জননী সে জন্য যারপরনাই দুঃখিনী, চালপড়া, জলপড়া, মাচপড়া, বার্ কলসীর জল, কালকাসুন্দ্যার শেকড়, কন্যার বাম চরণের রেণু জামাইকে কত খাওয়াইলেন, বশীকরণমন্ত্র যেখানে যাহা ছিল সকলি অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, জামাই মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, ঘরে আসে না, যদি আসে কথা কয় না, সুমিত্রা-প্রদত্ত রক্তবসনের একগাছি দশী জননী অতীব ভক্তিসহকারে তনয়ার কবরীতে বন্ধন করিয়া দিলেন, নিশি অবসান না হইতে হইতেই জামাই কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সুমিত্রা-সম্বন্ধে আর একটি অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স-দোষ বলিয়া সকলে সে ব্যাপার বিশ্বাস করিত না। সুমিত্রার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা, স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘকলেবরা, মস্তকে কাঞ্চনবরণ চিকুর-গোছা, শরীরে এত শক্তি যে দুই মণ দুদের কলসী অবলীলাক্রমে লীলার ঘটের ন্যায় বহন করে, কলহে কালভৈরবী, পরনিন্দায় বিশেষ পারদর্শিনী ; সুমিত্রা সতী বলেই হউক, কিংবা তাহার কলহদক্ষতার ভয়েতেই হউক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কখন কাণাকাণি করে নাই ; প্রচার হইল সুমিত্রা শোণিতসিক্তবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পবিত্র-হৃদয়ে গোয়াল ঘরে মৃত স্বামীকে আহ্বান করে, স্বামী প্রেত-ভূমি পরিহারপুরঃসর সশরীরে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে দেখা দিয়া যায়। সুমিত্রা বলিল, সে তাহার পতিকে বিলক্ষণ

চিনিতে পারিয়াছিল। কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে, সে পতির প্রতিনিধি মাত্র। যদি বর্ত্তমান সময়ে এ অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত হইত, অভিনব সম্প্রদায় অম্লানবদনে বলিতেন, সুমিত্রা বাহার দিবার জন্য ম্যাজেণ্টার দ্বারা বসন ছোপাইয়াছিল।

দামু ঘোষের বর্ষীয়সী জননী নিশীথসময়ে একাকিনী যূথভ্রষ্ট সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর অনুসন্ধানে অশ্বত্থ মহীরুহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে নিজনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সন্ন্যাসীর সমক্ষে শ্মশান-বিহারী ভূত পেতনী সসজ্জা সমাগত। সন্ন্যাসী দিবসে কোন মনুষ্যের সহিত বাক্যালাপ করেন না; কিন্তু রজনীতে অভ্যাগত অপদেবতাদিগের সহিত তড়্বড়্ করিয়া কথা কহিতেন। যমরাজ গৃধিনীযুগলপ্রযোজিত অশ্ব-পঞ্জর-শকটে শনৈঃ শনৈঃ শব্দে সন্ন্যাসীর নিকটে আগমন করিলেন। বক্রশ্মশ্রু মাম্‌দো ভূত শকটের সারথি; উদ্বন্ধনে মৃত মানবের নাড়ী ভুঁড়ীর বল্‌গা; সদ্যোনিহত বারবিলাসিনীর একা বেণী চাবুক; উজ্জ্বল আলেয়াদ্বয় দীপ; নবশিশুমুণ্ডবিমণ্ডিত-মুক্তামালালঙ্কৃত যমরাজ কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর আবক্ষোবিলম্বিত ধবলচামরবৎ শ্মশ্রু অবলোকন করিতে লাগিলেন; বাসনা—একবার তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া জন্ম সফল করেন। রাজার ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখিয়া সন্ন্যাসীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত; অনন্তর যমরাজ অদ্ভুত ভূতের ভাষায় বিড়্ বিড়্ করিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী অদ্ভুত ভূতের ভাষায় কতদূর পারদর্শী তাহা তিনিই বলিতে পারেন; দামু ঘোষের মাতা অদ্ভুত ভূতের ভাষায় সম্পূর্ণানভিজ্ঞা; সুতরাং যমরাজের অভিবাদনমর্ম্ম নরলোকে অপ্রকাশিত রহিল। সন্ন্যাসী রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে অনুমতি দিলেন। রাজা আসন গ্রহণ না করিয়া যুবরাজকে সন্ন্যাসীর সম্মুখে দিয়া

কহিলেন, "হে, ভূতকুলশিরোভূষণ মৃত্যুঞ্জয়-মুখ্য-মন্ত্রি ব্রহ্মদৈত্য মহোদয়, এই আমার ঔরসজাত যুবরাজ, আমি এক প্রকার রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছি, ইনিই এক্ষণে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, যুবরাজ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বোধ হয় বাবাজীর মত তুটি নাই, আপনি কোল দিয়া বাবাজীর সম্মান বৃদ্ধি করুন।" সন্ন্যাসী যুবরাজকে কোল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবরাজ, তোমার বয়স কত ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি তবে কি জান ?

যুবরাজ। লোকের সর্ব্বনাশ কর্‌তে।

সন্ন্যাসী। তুমি কত দিবস রাজ্য করিতেছ ?

যুবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তোমার বিবাহ হইয়াছে ?

যুবরাজ। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী। সেটা জানিলে কি প্রকারে ?

যুবরাজ। বউ আছে।

সন্ন্যাসী। বয়ের বয়স কত ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি জীবিত না মৃত ?

যুবরাজ। জীবিত।

সন্ন্যাসী। প্রমাণ কি ?

যুবরাজ। নিশিতে বাঁশী বাজিলে জননী আহার করেন না।

সন্ন্যাসী। তোমার হস্তে প্রত্যহ কত লোক ধ্বংস হয় ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

যমরাজ। প্রভো, যুবরাজ শট্‌কেতে কিঞ্চিৎ কম মজ্‌পুত,

আঁতুড়ঘরে আরশুল্যায় বাবাজীর মস্তিষ্ক আহার করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী। খোল পুরাইলে কি দিয়া ?

যমরাজ। গোময়।

সন্ন্যাসী। সেই জন্যে এমন ঘুঁটে-বুদ্ধি !

যমরাজ যুবরাজ ঘুঁটে-বুদ্ধি বটেন ; কিন্তু বাবাজীর অসাধারণ সংহার-পাণ্ডিত্য, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা অঙ্কবিদ্যায় নাই।

সন্ন্যাসী। দেখ যমরাজ, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ম্মই সংহার ; কিন্তু তাঁহার এমত অভিপ্রায় নহে, যে তাঁহার পরিচারকেরা কেহ অসঙ্গত সংহার করে ; পৃথিবী মৃত্যুঞ্জয়ের কুসুমোদ্যান ; তরুগুলি সজলজলদরুচি লতাপল্লবে অবিরত সুশোভিত থাকে, কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সুশীতল-সমীরণ-সহকারে সৌরভ-বিতরণ দ্বারা সকলের চিত্ত-বিনোদন করে, এই তাঁহার ইচ্ছা ; পরস্ত্রীকাতর, পাষণ্ড, নির্দ্দয় নীচাত্মারা কাননের কোমল পত্র ছিন্ন করে, বসন্তানিলান্দোলিত মুকুলভারাবনত লতিকার উচ্ছেদ করে, পরিমল-পরিপূর্ণ বিকাশোন্মুখ অথবা বিকাশিত কুসুমসমূহ অবচয়ন করে, তাঁহার অভিপ্রায় নহে। এতদুদ্যান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন ; যে সকল পাতা সময়ক্রমে শুষ্ক হইয়া বাতাঘাতে নিপতিত হয়, যে সকল লতা দিন দিন রসহীন হইয়া স্বতঃই ধরাশায়ী হয়, যে সকল কুসুম কালসহকারে রসহীন সৌরভশূন্য এবং অসংলগ্নদাম হইয়া ভূমিতে শায়িত হয়, তাহাই তুমি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত করিবে। যমরাজ, তুমি উদ্যানের সংমার্জনী মাত্র। কিন্তু তুমি এমনি পাষণ্ড, তোমার গণ্ডমূর্খ যুবরাজ এমনি সর্ব্বনাশামোদী, তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই এমন মনোহর উদ্যান ছারখার করিয়া তুলিয়াছ। তুমি ভাব, ভগবান্

ভোলামহেশ্বর ভাঙ্‌ ধুতুরায় নিশিযামিনী বিভোল, দূরপ্রদেশের শাসনপ্রণালীর কোন সংবাদ রাখেন না, সেটি তোমার অতিশয় ভ্রম; তোমার দৌরাত্ম্য, তোমার যুবরাজের দুঃসহনীয় অত্যাচার, মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হইয়াছে; সেই দণ্ডেই তোমাকে পদচ্যুত করিতেছিলেন, কেবল তোমার বৃদ্ধা জননীর সকরুণ রোদনে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছেন। অকালমৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় যারপরনাই অসন্তুষ্ট; আর তুমি এমনি অপরিণামদর্শী, অকাল-মৃত্যুই আজকাল তোমার প্রধান কর্ম্ম। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভয় থাকে, তবে অচিরাৎ অকালমৃত্যু হইতে বিরত হও, নচেৎ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুমত্যনুসারে এক আষাঢ়দণ্ডাঘাতে তোমাদের মুণ্ডদ্বয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। কল্য প্রাতে লোকে দেখিবে দুটি দাঁড়কাক মরিয়া রহিয়াছে।

যমরাজ। হে অমাত্যপ্রধান, অকৃতাপরাধে অকিঞ্চনের অবমাননা করিবেন না। আমার জানত কোন স্থানে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয় নাই। আপনি প্রদেশের নাম ব্যক্ত করুন, আমি প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হই, আমার জীবনান্ত করিবেন।

সন্ন্যাসী। যমরাজ, তুমি হস্তিমূর্খ; তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি জনসমাজ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, অকালমৃত্যু বীরদম্ভে বিহার করিতেছে, মর্ম্মান্তিক শোকে লোকে অভিভূত,—বিচারালয়ে নবীন বিচারপতির শোকে শূন্য আসন হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে, সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে তেজঃপুঞ্জ নবীন সম্পাদকের বিরহে লেখনী শুষ্কজিহ্বায় অচেতন, নাট্যশালা নাটকাভিনয়প্রিয় নবীন পালকের অকালমৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, মহাভারত নবীন অনুবাদকের অভাবে লুপ্তপ্রায়। যমরাজ, তোমার নূতন লেখনীর শত শত উদাহরণ দিতে পারি, তুমি কি সাহসে অপবাদের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত,

অস্মদের কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না ; তুমি যুবক নিধন করিয়া ক্ষান্ত নও ; তুমি শোকের উপর শূল সন্ধান করিয়াছ ; যে সকল মানবের জীবনপাট্টার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উচ্ছেদ কর নাই, সুতরাং তাহারা পুনরায় জীবন আরম্ভ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে,—মীনহট্ট নামে বারমহিলাপল্লীতে দেখিলাম, একজন অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ টাকপড়া মস্তকে জরির টুপি দিয়াছেন, দাড়ীর দৌরাত্ম্যে সকালে বৈকালে নাপিতের আশ্রয় লওয়া হয়, গোঁপে কলপ, পরিধানে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে জামদানের পিরান, ঢাকাই উড়ানীখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলা, পায়ে ক্লারপেটি জুতা, কোমরে সোণার গোট, গোট হইতে সোণার চাবিশিকলি লম্বমান, মাংসশূন্য অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী, হাতে একগাছি একপাব বেত, গলায় গড়ে মালা, দন্তে গোলাপী মিসি। বৃদ্ধ জনৈক নবীনা বারাঙ্গনাকে দেখিয়া যেমন দন্ত বিস্তার করিয়া হাঁসিলেন, স্বৈরিণী অমনি একটি কুসুমগোচ্ছা তাঁহার দন্তোপরে নিক্ষেপ করিল, আর দন্তগুলি ঝর্‌ঝর্ করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল,—দাঁতগুলি কৃত্রিম।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-যাত্রার সকল উদ্যোগ, —তাহার পুত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাষ্ঠতণ্ডুল তৈল বস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিল, রূপার যোড়শ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। রাজীব মরিতে অসম্মত, মরণের পরিবর্ত্তে পরিণয়ের জন্য ব্যাকুল ; অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের কেলিকুঞ্চিকা কন্যার সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। পাত্রটি যদিও শ্মশানের ফেরত, তথাপি শ্বশুর রীতিমত বরসজ্জা দিতে কৃপণতা করেন নাই। বরসজ্জার ভিতর একটি রূপার যোড়শ ছিল। শ্বশুরের অবস্থা এমত নহে যে তিনি রূপার বরসজ্জা দেন, কিন্তু রাজীব শ্বশুরের মুখোজ্জ্বল হেতু তাহার পুত্রদিগের প্রস্তুত রূপার যোড়শ

গোপনে দিয়া বলিয়া দিয়াছিল, রূপার ষোড়শটি বরসজ্জা বলিয়া দান করিবেন। রাজীবলোচন অদ্যাপি জীবিত; কিন্তু মুমূর্ষু। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অষ্টপ্রহর কেবল নববিবাহিতা বনিতার অলকায় দোল দিতেছে।

যমরাজ, এই কি তোমার শাসনপ্রণালী? এই কি তোমার দয়া-নিধান গম্ভীরস্বভাব মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা? তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর, মূঢ়, পামর, অকর্ম্মণ্য। তুমি যদি এবম্বিধ বিবিধ অহিতাচারের সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পার, এই দণ্ডে তোমাকে পদচ্যুত করিয়া যমদণ্ড অপরের হস্তে অর্পণ করিব।

যুবরাজ। ব্রহ্মদৈত্য মহাশয়, পিতা মহাশয়ের কোন অপরাধ নহে, যে সকল দুর্ঘটনা বর্ণন করিলেন, তাহা ভুলক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী। কাহার ভুল?

যুবরাজ। বাণের ভুল।

যমরাজ। বাবা যুবরাজ, বিশেষ করিয়া ভ্রমের বিবরণ ব্যক্ত কর।

যুবরাজ। এক দিন সমস্ত দিন স্বকার্য্যসাধনানন্তর সন্ধ্যাকালে শমনবাণটি মহাদেরেব মন্দিরের পশ্চাৎ শিমূলগাছের ডালে ঝুলাইয়া এক ডালে মাথা এক ডালে পা রাখিয়া শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎপরে কন্দর্প কাকা উপস্থিত হইলেন, তিনিও শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া ঐ গাছের ডালে ফুলবাণটি ঝুলাইয়া নিকটস্থ একটি শিমুল ফুলের কলিকায় শয়ন করিলেন। নিশি অবসান। হাঁড়ীচাঁচা, শকুনি, পেচক কলরব করিতেছে, চাষারা মরা গরু লইয়া ভাগাড়ে ফেলিতেছে, ঠাকুরদাদা মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রথ প্রস্তুত, গমনের আর বিলম্ব নাই, আমার এবং কন্দর্প কাকার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। হঠাৎ

ঠাকুরদাদার রথচক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগিল। আমরা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তাড়াতাড়িতে শমন-বাণের সহিত ফুলবাণের বিনিময় হইয়া গেল। সেই দিন হইতে পৃথিবীতে মহা বিভ্রাট। কন্দর্প কাকা যুবক যুবতী দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, আর তাহারা তদ্দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; আমি মৃত্যুঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বৃদ্ধদিগের প্রতি শরসন্ধান করি, কিন্তু তাহারা না মরিয়া শুষ্ককাষ্ঠে কচি পাতার ন্যায় অপ্সরা-মনোরঞ্জন বেশ বিন্যাস করে।

সন্ন্যাসী। বাণ বদল করিয়া লইয়াছ ?

যমরাজ। আজ্ঞে না, কন্দর্প কাকার দেখা পাচ্চি না।

সন্ন্যাসী। তুমি অদ্য শিমুল বৃক্ষে ফুলবাণ লইয়া অবস্থান কর, আমি কন্দর্পকে শমনবাণ লইয়া সেখানে আসিতে আহ্বান করি, কন্দর্প আগত হইলে বাণের বিনিময় করিয়া লইবে।

যমরাজ এবং তাহার অকালকুষ্মাণ্ড যুবরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। দামু ঘোষের মাতা গাভী অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না, দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রতিবেশীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিল। তদবধি গ্রামের জনপ্রাণী শিমুল বৃক্ষের নিকট যায় না।

এক দিন সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে রাখালেরা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর শ্বেতশ্মশ্রু-আবৃত মুখ অবলোকন করিতে লাগিল। একজন সিদ্ধান্ত করিল, সন্ন্যাসীর হাঁ নাই; একজন বলিল, সন্ন্যাসীর জটার ভিতর কেউটে সাপ রক্ষিত; একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে একটি সপল্লব আম্রশাখা নিক্ষেপ করিল; একজন পাঁচনি দ্বারা সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে খোঁচা দিল; সহসা সন্ন্যাসী একটি হাই তুলিলেন, আর গালের প্রকাণ্ড গহ্বর রাখালদিগের

নয়নগোচর হইল, অমনি তাহারা দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন, রাখালেরা আবার ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী। সন্ন্যাসীর ঝুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শিশু মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, শিশুদিগের গলায় তামার মাদুলি, মস্তকে কেশ-বিন্যাস করিয়া ঝুঁটি বাঁধা, তাহাতে সোণার পুঁটে, কর্ণে কুণ্ডল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখালদিগকে যারপরনাই ভীত করিল, তাহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গ্রামের ভিতর গিয়া সকলকে জানাইল, সন্ন্যাসী ছেলেধরা, অনেক ছেলে ধরিয়া ঝুলির ভিতর রাখিয়াছে। গ্রামের লোক অমনি সতর্ক হইল, শিশুদিগের আর বাড়ীর বাহির হইতে দেয় না, রাত্রিতে কেহ দ্বারোদঘাটন করে না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, এক দিন মধ্যাহ্ন সময় প্রখর-প্রভাকর-করনিকরে অবনী দগ্ধবৎ, পুষ্করিণীর নীর সীতাকুণ্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ-আতপ-তাপিত গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত, কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া গৃহিণী-প্রেরিত পান্তাভাত কচিনেবু-রস-সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, শুষ্ককণ্ঠে জল প্রার্থনা করিতে চাতকিনীর কণ্ঠরোধ, বিজাতীয় রৌদ্র, কাহার সাধ্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখে;—এমন সময় মহাদেবের মন্দির হইতে সপ্তমস্বরে চীৎকার শব্দ আসিতে লাগিল যে, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমায় রক্ষা কর।" কৃষকেরা, রাখালেরা, গ্রামের অপরাপর লোকেরা অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে মন্দিরে আসিয়া দেখে, সন্ন্যাসী একটি অগ্নিচক্র করিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে,

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না। সকলে ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর দিবস সন্ন্যাসী ঐরূপ অগ্নি জ্বালিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক লোক চীৎকার শুনিয়া আগত হইল এবং ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রত্যহ এইরূপ করে, কিন্তু গ্রামস্থ লোক ক্রমে চীৎকার শুনিয়া তথায় আসা রহিত করিল। ঐরূপ চীৎকার শব্দ লোকের কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা বলে, "সেই পাগল ব্যাটা রোদন করিতেছে, সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, সন্ন্যাসী এক দিন বড় বড় কাষ্ঠের কুঁদা, স্তূপাকার শুষ্ক গোময় এবং বিচালি আহরণ করিল, যখন দেখিল কেহই কোথাও নাই, মহেশ্বরের অঙ্গ আবরণ করিয়া সেই সমুদয় পাঁজা সাজানার ন্যায় সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান-পূর্ব্বক কুলা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে দাবানলতুল্য ভীষণানল প্রজ্বলিত, কর্ম্মকারাগ্নি-কুণ্ড-দগ্ধ-লৌহবৎ পার্ব্বতীনাথের প্রস্তরাঙ্গ পরিতপ্ত, সমৃদ্ধিশালী অনল-জ্বালা সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম মহাদেব অতীব কাতরতা-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।" গ্রামের লোক প্রত্যহ এইরূপ রোদনধ্বনি শুনিত, এবং প্রত্যহই পাগল সন্ন্যাসীর ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ করিত না, অদ্যও সকলে সেই ব্যাপার স্থির করিয়া কেহই মন্দিরের নিকট আগমন করিল না; মহাদেব নির্জ্জনে নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রদোষকাল উপস্থিত; কাঞ্চনকান্তি সূর্য্যমণ্ডল দূরস্থ আম্রকাননাভ্যন্তরে নিমগ্ন; বিচরণানন্তর বিহঙ্গমকুল কুলায়ে গমন করিতেছে; গাভীদল

দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগত ; ব্রাহ্মণেরা ঘাটে কাষ্ঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা করিতেছে ; বামাকুল পরিশুদ্ধ বসন পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র-হৃদয়ে গোলায়, গোয়ালঘরে, তুলসীপিড়িতে দীপ দেখাইতেছে। এমন সময় প্রবল হুতাশনে মহাদেবের মস্তক দ্বিধা হইয়া গেল, আর মূর্দ্ধদেশনিহিত স্পর্শমণি ছিট্‌কাইয়া সমীপস্থ ক্ষেত্রোপরি নিপতিত হইল। তদ্দণ্ডে সে স্থলে একটি হ্রদ উৎপাদিত এবং স্পর্শমণি সেই হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীর হর্ষে বিষাদ। যে স্পর্শমণি প্রাপ্তাভিলাষে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া মন্দিরের সমীপস্থ অশ্বত্থমূলে অনাহারে কাল যাপন করিতেছিলেন, সেই স্পর্শমণি বাহির হইল, কিন্তু বাহির হইয়াই গভীর হ্রদমধ্যে নিমগ্ন। মহাদেবের শিরোমধ্যে নিহিত থাকায় স্পর্শমণি যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হওয়ায় সে দুষ্প্রাপ্যতার খর্ব্বতা হইল না। তবে স্পর্শমণি সন্ন্যাসীর নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার আয়াসের কিয়দংশে সাফল্য জন্মে। সন্ন্যাসী বিলক্ষণ জানিতেন, অধ্যবসায়ের ফল সফলতা। তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই নবোৎপাদিত হ্রদের জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে সমুদায় জল হ্রদচ্যুত হইবায় স্পর্শমণি প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় হ্রদগর্ভে দীপ্যমান হইল। সন্ন্যাসী পরমানন্দে স্পর্শমণি উত্তোলনপূর্ব্বক কক্ষস্থ ঝুলিতে রক্ষা করিয়া গ্রামস্থ লোকেরা জাগরিত হইবার অগ্রেই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

['মধ্যস্থ', ১৮, ২৫ কার্ত্তিক ও ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৯]

কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা বোকা-রাজার পড়ো বাড়ী

(ভোঁদার প্রবেশ)

ভোঁদা। কত পন্থায় ফিরি, তা কে বুঝ্‌বে? এই যে বিচারপতি বলদপঞ্চাননকে অভিনন্দনপত্র দেরার অভিসন্ধি করেছি, এতে আমার কত উপকার, তা আমিই জানি, সবই কি বিবাদে জয় পতাকার পথ? সকলে জান্‌তে পাচ্ছে, আমি একজন কম নই; দিশী কাগজওয়ালারা যেমন আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত করেন, তেমনি জব্দ; ধনাঢ্য রাজাটার সঙ্গে মিশ্‌লেম আর ছেলেপিলেগুলোর সহায় হলো। তবে এক মুখে দুই কথা ছেপ্‌ ফেলে ছেপ্‌ গেলা, এই একটু দোষ, তা ব'লে এত উপকার পা দিয়ে ঠেলতে পারিনে।

(গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা, স্বার্থকদাস, সাত হাটের কাণাকড়ি এবং হুতোম পেঁচার প্রবেশ)

গোমা। মহাশয়, সমুদ্রকে রত্নাকর বলে, কিন্তু তা ব'লে কি তাতে শামুক-গুগ্‌লী থাকে না? কলিকাতা সুবিবেচক, বিদ্যাবিশারদ, দেশহিতৈষী লোকের আবাসস্থান বটে, কিন্তু তা ব'লে কি দুটো একটা লম্বোদর স্থূলবুদ্ধি গবারাম নাই যে, আমার অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করে? দেখুন, প্রায় দুই হাজার সহি হয়েছে।

ভোঁদা। চিরজীবী হও বাপু, বড় বাধিত হলেম, ভেবেছিলেম যে মলা গুলেছি, তা বুঝি উদরস্থ কত্তে পাল্লেম না; কিন্তু বাপু, তোমার কল্যাণে শুধু উদরস্থ নয়, পরিপাক কর্‌বো।

গ্যাঁটাগোঁটা। মহাশয়, আমার শাদা রাজহাঁসের পাকনার

জোরে আমি একা এক সহস্র, বেটার টু রেণ্ ইন্ হেল্ দ্যান্ সর্ভ ইন্ হেভেন—আমাদের দলের নাম হয়েছে "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" ভালই, আপনাকে এই দলের মস্তক বল্‌চে, আমাকে এই দলের সপোর্টকারী সম্পাদক বল্‌চে। মানের কথা বল্‌বো কি, আমার কাগজ আছে, এ কেউ জান্‌তো না ; এখন আমার কাগজের নাম দেশ-বিদেশে জাহের হয়েছে।

স্বার্থকদাস। আমি তোমাদের অমতে চল্‌বো না। কিন্তু যথার্থ কথা বল্‌তে হয়, তোমাদের যদি নাম বাহির করবের ইচ্ছাই ছিল, তুমি কেন বাগবাজারের বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে আগুন দিলে না? এমন ক'রে মলে কেন? সে দিন যাকে বঙ্গদেশ-বিদ্বেষী বলিয়া বক্তৃতা কল্লে, আজ তাকে কি ব'লে অভিনন্দন দিতে যাও? আমি পেটের দায় নাম লিখেছি।

সাত হাটের কাণাকড়ি। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন ; যখন যেমন, তখন তেমন ; জল পড়ে ছাতা ধরি—ভোঁদা মহাশয় যখন এতে হস্তক্ষেপ করেছেন, তখন কিছু না কিছু হবেই। চিল্‌টে পড়্‌লে কুটোটা নিয়ে ওঠে। কিন্তু এক মণ তুলা ভারী কি এক মণ নোয়া ভারী, প্রশ্ন উপস্থিত হচ্চে। আমরা যত নাম কেন স্বাক্ষর করি না, ভাব পৌঁছিচ্চে না।

ভোঁদা। ভাবে আসে যায় কি? লোকে তো বুঝ্‌বে, আমরা যেটা ধরেছিলেম, সেটা সম্পাদন করেছি, ভেঙ্গে তো বেরিয়েছি।

স্বার্থক। ও ভাঙ্গাতে দল ভাঙ্গে না। গাছ সতেজ হবে ব'লে মরকুটে ডালগুলো কেটে দেয়, কুকুরের অনেক ছা হলে জঘন্য দেশে গোটাকত মেরে ফেলে, কারণ, ভাল শাবকগুলিন তা হলে অপর্য্যাপ্ত আহার পেয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা ভেঙ্গে আসায় বঙ্গসমাজের শুভ সাধন হয়েছে।

ভোঁদা। এ সব এখানে বল্‌চো—বলো, অপর কোন স্থানে এরূপ কথা মুখে এনো না—আমরা কিসে কম, আমাদের দলে না আছে কি? হুতোম পেঁচা মহাশয় যে ওষ্ঠ ফাঁক কচ্চেন না?

হুতোম। পেঁচা প্যাঁচপোঁচ বোঝে না, সহি কত্তে বল্লেন কল্লেন, এতে ভাল হলো কি মন্দ হলো, তা যদি আমার বুঝ্‌বের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হ'লে আমি পূর্ব্বে যা কিছু করেছি, তা জেনে আপনারা কখনো আমার স্বাক্ষর আন্‌তে যেতেন না।

স্বার্থক। হুতোম পেঁচা বড় লক্ষ্মী পেঁচা, যে যা বলে, তাই শোনে। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, কাল বিচারমন্দিরে সাক্ষাৎ হবে।

হুতোম। আমি যেতে পারবো না, বলদপঞ্চাননের মুখ দেখ্‌লে আমার সাবেক কথা সব মনে পড়্‌বে, আর অমনি ব'লে ফেল্‌বো, আমার স্বাক্ষর হাতের, মনের নয়।

স্বার্থকদাস। ডিটো।

সাত হাটের কাণাকড়ি। ডিটো।

গোমা। ওঁরা না যান, নাই যাবেন—বলদপঞ্চানন কেবল ভোঁদা, গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা এই তিন জনকেই চেনেন। এঁরা গেলেই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিচারমন্দির

(বলদপঞ্চানন আসীন)

বলদ। আশার সুসার বুঝি হলো না হলো না।
ভোঁদা, গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা এখন এলো না॥

সুখ্যাতি লিখন ভাগ্যে নাহিক আমার।
অন্যায় অখ্যাতি তাই করিনু সবার॥
সেই হেতু বঙ্গবাসী মহোদয়গণ।
সুশীল সুবোধ যারা দেশের ভূষণ॥
অবহেলা তারা সবে করিল আমায়।
মুখ-দোষে মুখপানে কেহ নাহি চায়॥
মেটাতে দুধের স্বাদ ঘোলের কেঁড়েয়।
বেড়ে বেড়ে বেঁড়ে বেঁড়ে ধরেছি এড়েয়॥
ভোঁদা গোমা গ্যাটাগোঁটা হয়ে একযোট।
বেঁধেছে অপূর্ব্ব "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ"॥
তারাই করিবে পার নিন্দাপারাবার।
এই কি ছিল মা গঙ্গে কপালে আমার॥

(ভোঁদা, গোমা ও গ্যাটাগোঁটার প্রবেশ)

ভোঁদা। হে বিচারপতি, আমাদের সংখ্যার অল্পতাদৃষ্টে আপনি মনে কোন ক্লেশ বোধ করিবেন না। আপনার মিষ্টবাক্যে সকলেই তুষ্ট, কেবল পাঁকুই ধর্‌বে আশঙ্কায় সকলে এলেন না, বিশেষ এপিডেমিকে মানুষ ক'মে গিয়েছে। আপনার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু মধুর বচনে দেশটা শুদ্ধ লোক বশীভূত।

পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমকরুণয়া পশ্যতি দৃশা,
পরাপত্যদ্বেষী স্বসুতমপি নো পালয়তি যঃ।
তথাপ্যেষোঽমীষাং সকলজগতাং বল্লভতমো,
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধুরবচসঃ কেনচিদপি॥

কোকিলের কত দোষ, কালো বর্ণ, রক্তিমাবর্ণ চক্ষু, পরের সন্তানের প্রতি দ্বেষ, স্বীয় সন্তানকে প্রতিপালন করে না, তথাপি এই কোকিল সকল জগতের প্রিয়পাত্র, সেটা কেবল মধুর স্বরের গুণে। আপনি আমাদের চোর বলেছেন, ডাকাত বলেছেন,

জালসাজা বলেছেন, মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপনি কালো চামড়ার এক সাজা দিয়েছেন, শাদা চামড়ার আর এক সাজা দিয়েছেন, আপনি আমাদিগকে নীচজাতি বলিয়া গণ্য করেছেন, আপনি পথ ভুলেও এক দিন কোন পাঠশালা দেখিতে যান নাই, কিন্তু এত করেও আপনি মধুর বচনে সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। সেই যে আপনি বিচারাসনে ব'সে, দাড়ী নেড়ে, মেজ চাপ্‌ড়ে, গাইবাচুরে স্থরে তান মাত্তেন, তাতে সকলেই মোহিত হয়ে যেত, আপনার ধান ভান্‌তে শিবসঙ্গীত আরো ভাল লাগ্‌তো। আমরা আপনাকে যে অভিনন্দনপত্র দিতে এসেছি, তা এই—(অভিনন্দনপত্র পাঠ)

"বাঙ্গালীর নামে অগ্নিশর্ম্মা বলদপঞ্চানন বিচারপতি

শ্রীউরোতেষু

এলে লক্ষ্মী গেলে বালাই দেশ বাঁচ্‌লো বাপ।
কোন কালে কেউ দেখে নি এমন কলির কাপ॥
সাধ্যমতে বাধ্য কল্লে নতুন বিচার করে।
যশোপত্র কল্লে লাভ জনকতকে ধ'রে॥'

বলদপঞ্চানন। উন্‌পাজুরে লক্ষ্মীছাড়া বরাখুরের দল।
যাবার বেলা খাবার মাচ মানস সফল॥
গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়।
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয়॥

ভোঁদা। (জনান্তিকে বলদপঞ্চাননের প্রতি) ছেলেদের জন্য একটু স্থকতলা দিয়ে যাবেন। (প্রকাশ্যে)

চল ভাই ঘরে যাই পালা হলো শেষ।
এইরূপে বার বার মজাইব দেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

য ব নি কা প ত ন।

[বসুমতী-প্রকাশিত 'রায় দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী'—১৩০৮।]

বিবিধ—পদ্য

কলিকাতায় হিন্দুকলেজে পাঠকালে দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' কবিতা লিখিতেন। এই সকল কবিতার যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল। প্রথম বারোটি কবিতা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর পুত্রগণ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'বঙ্গদর্শন' হইতে সংগ্রহ করিয়া 'পদ্য-সংগ্রহ' নামে প্রকাশ করেন; দুই-একটি ছাড়া সকলগুলিই তাঁহার বাল্যরচনা। ইহার যে কবিতাগুলি তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে, সেগুলির পাঠ 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'বঙ্গদর্শনে'র সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা ছিল, সেগুলি বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হওয়ায় কয়েকটি কবিতার ("দম্পতী-প্রণয়। বিজয় কামিনী", "জামাই-ষষ্ঠী—প্রথম বারের" ও "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ") পাঠ মিলাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই,—'পদ্য-সংগ্রহে'র পাঠই হুবহু গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, 'পদ্য-সংগ্রহে'র পাঠের সহিত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কবিতার পাঠে স্থলে স্থলে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

মানব-চরিত্র

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়ে।
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয় হিয়ে॥
এক জীবে আর ফল স্বভাব অভাব।
পদ্মরাগ-আকরেতে কাঁচের প্রভাব॥
জনগণ বিবরণ করিতে বর্ণন।
অশ্রুধারা ধারে ধারে বক্ষেতে বর্ষণ॥
চিন্তামণি-চিন্তা চিত্ত চিন্তা নাহি করে।
অসার সংসারছায়া কায়া বলে ধরে॥
অন্তর্যামী জন হতে অন্তর অন্তর।
অনিত্য নিধির তত্ত্বে চিন্তিত অন্তর॥
মায়া মোহ মহা ঘোর অঘোর তিমির।
তদাবৃত ধরাবন বিষম গভীর॥
এ কাননে নরগণ বিবৃত বিপদে।
হরি করী করী-অরি অরি পদে পদে॥
মায়া ব্যবধানে আঁখি অন্ধ দেখিবারে।
বনমাঝে মনমৃগ ধৃত বারে বারে॥
রুষ্টচিত্ত সদানন্দে অন্তর বিকৃত।
রিষ্টচিন্ত সদানন্দ ধনেতে বিক্রীত॥
কোষাসক্তমনা নর আপনা বিস্মৃত।
গরল সরল জ্ঞান অনর্থ অমৃত॥
হিতকারী অপকারী বোধ সবাকার।
অপকারী অপকারী নহে কেহ কার॥
আশা মদ্যপানে মত্ত মনোন্মত্ত অতি।
রথচক্রগতি মত ঘুরিতেছে মতি॥

কি করিতে কোথা গত কবে কোথা যাবে।
ভবে এসে পাশে বদ্ধ ভ্রমে নাহি ভাবে ॥
একেবারে শত আশা হৃদয়ে উদয়।
ভাবিতে ভাবিতে তারা আর নাহি রয় ॥
কত ভাবে কত ভাবে করে কত ভাব।
দীর্ঘসূত্র দীর্ঘ শত্রু নাশে সব ভাব ॥
মনবিবরণ কথা কহনে না যায়।
বোধ হয় ধরা যায় ধরিতে পলায় ॥
ব্যগ্রচিত্তে স্নিগ্ধ হয়ে করিয়ে মনন।
একমনে ভেবে দেখি মনে নানা মন ॥
যদিও অসংখ্য ভাগি বিভক্ত এমন।
শত শত মন তার এক এক মন ॥
মনে ভাবি এক মনে ধরি এক মনে।
অন্যমনা মন পরে হেরে অন্য মনে ॥
এ কারণ অপকর্ম্মে নর তৃষ্ণাতুর।
মনে মুখে অনেকতা শঠত্বে চতুর ॥
ভাবে এক বলে আর কাযে করে অন্য।
বাহিরেতে মকরন্দ মনেতে জঘন্য ॥
অহঙ্কার অলঙ্কার ব্যসন বসন।
অকথ্য কাহিনী কথা অভক্ষ্য অশন ॥
পরের বনিতা মাতা ঘোষণা জগতে।
শ্বশুর-দুহিতা তিনি আধুনিক মতে ॥
জপ তপ দান ধ্যান স্নান পূজা যত।
কালে কালে একে একে হইয়াছে হত ॥
অন্তঃপুর সুরপুর ভূলোক গোলোক।
জায়া-কায়া-আলোকনে আলোক পুলক ॥

একাকিনী রাখি কেহ আপন কামিনী।
বারবিলাসিনী সহ যাপেন যামিনী॥
ভবার্ণবে নরগণ অর্ণবের যান।
পথ-প্রদর্শক জ্ঞান সুপথে চালান॥
জ্ঞানের বিহীন এবে অবনীমণ্ডলে।
কর্ণধারহীন তরি যথা তথা চলে॥
কুমতি কুবায়ু তাহে বহে অনুক্ষণ।
ভূতলে পতিত হয় না হয় রক্ষণ॥
ভেবে চিন্তে চিন্তা দূর হইলাম তৃপ্ত।
পৃথিবী পাগলাগার মানবেরা ক্ষিপ্ত॥
ইষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয় তুষ্ট কষ্টভোগে।
ভিষকে অবজ্ঞা করে জীর্ণকায় রোগে॥
যে দোষে সরোষ হয় সে জনে বিরস।
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস॥
পাপানলে গ্রহ দাহ হয় শিরোপরে।
তথাপি সে ঘরে নরে রয় অকাতরে॥
শমন-শার্দ্দুল আসে গ্রাসিবারে অঙ্গ।
অনাতঙ্কে দেখে রঙ্গ মানব-কুরঙ্গ॥
মহাকাল কালসর্প দংশিতে আগত।
শুভ্রকেশ শিশু তারে করে করাগত॥
ধরণী-বিপিনে ব্যাধ কৃতান্ত দুর্দ্দান্ত।
দেখে জালে পড়ে নর দুর্ম্মতি নিতান্ত॥
মৃত্যুশর অগ্রসর বিন্ধিবারে বক্ষে।
দেখে বাণ আগুয়ান বিপক্ষ স্বপক্ষে॥
বিধিমত আচরণে যম পরাজয়।
সশরীরে স্বর্গে যায় হইয়ে বিজয়॥

বিধি বিধি অনুষ্ঠান অমর সোপান।
অমর ভাবিয়ে সবে না ভাবে বিধান ॥
কত লোকে পরলোক দেখে কত লোক।
যারা শব তারা শব বলে সব লোক ॥
দিন গেলে দেহী বলে বাড়িছে বয়েস।
কালে কাল কালপ্রাপ্ত হয় আয়ুঃশেষ ॥
একপথগামী সবে যাবে এক স্থানে।
কিছু কিছু আগু পিছু বিধির বিধানে ॥
নবচ্ছিদ্র দেহে প্রাণ বায়ু অভিপ্রায়।
শতদলদলগত জলবৎ প্রায় ॥
কখন কোথায় যাবে জীবন চপল।
ভাবিলাম দুই করে ধরিয়ে কপোল ॥
দেখিলাম শুনিলাম করিলাম সায়।
পলকে পলায় প্রাণ নিরয়ে মিশায় ॥
মাটিতে গঠিত কায় মাটি হয়ে যাবে।
কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ-ভোগে আত্মা রবে ॥
নশ্বর শরীর এই স্থায়িত্ব-রহিত।
চৈতন্য বিহীনে হবে চৈতন্য-রহিত ॥
যে মস্তকে মতিঝিল* বিলাতি ধারায়।
ঝিলে গড়াগড়ি যাবে পড়িয়ে ধরায় ॥
যে অঙ্গ সরোজরাজ পরশনে শীর্ণ।
শৃগাল শকুনি শুনি করিবে বিদীর্ণ ॥
যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চুবাণ ॥

---

* ত্যাড়াকাটা।

যে রসনা রস বিনা পান নাহি করে।
দুর্গন্ধ কীটেতে ব্যাপ্ত হইবে সত্বরে॥
আসন্নে বিষণ্ণ মন আচ্ছন্ন মায়ায়।
আমাভাবে পরিবারে কি হবে উপায়॥
অকারণ কি কারণ হেন ভাব মন।
বৃথা গৃহ বৃথা স্নেহ বৃথা পরিজন॥
এ আমার ও আমার সে আমার বশ।
আমি তো কাহারো নহি আমারো অবশ॥
আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ।
আমার লোকেরে ভাবি আমার কারণ॥
সোদর সোদরা দারা তনয় তনয়া।
কোথা রবে তারা সবে হইলে বিজয়া॥
মরণান্তে কেহ মম সহগামী নয়।
গোময় ছড়ায় পথে পাছে মন্দ হয়॥
আপনা বঞ্চিয়া কোষে সঞ্চয় যে ধন।
সে ধন কোথায় রবে হইলে নিধন॥
কার জন্য করি করী হয় মনোহর।
মণিময় পুরী আর সুখ সরোবর॥
নানানিল বহিতেছে দেহের সমীপ।
এখনি নির্ব্বাণ হবে জীবন-প্রদীপ॥
এ আলয় খেলালয় লয় মম মনে।
রঙ্গ ভঙ্গ সাঙ্গ হয় হেরিলে শমনে॥
এই বেলা ত্যজ খেলা বেলায় বেলায়।
নতুবা প্রলয় হবে মজিলে খেলায়॥
মধ্যাহ্ন হয়েছে গত আগত বিকাল।
প্রাণভয় আসিতেছে সহ সন্ধিকাল॥

জীবনান্তে মৃত্যু শশী যে হবে উদিত।
হৃদ্হ্রদে হৃৎপদ্ম হইবে মুদিত ॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বাসনা।
কর মন পরিজন ত্যজিয়া কামনা ॥
হরিনাম কর বলি ধর করতলে।
রিপুদল খণ্ড খণ্ড হবে ভূমণ্ডলে ॥
পরম পবিত্র ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন।
দয়াশীল কৃপাময় অঞ্জনভঞ্জন ॥
ভক্তির অধীন তিনি সদা আশুতোষ।
অল্প কালে স্বল্প তপে হয়েন সন্তোষ ॥
অষ্ট অক্ষি অষ্ট অরু প্রভাব ভুবনে।
দুঃখ নিবারণ হেতু দেখেন যতনে ॥
চারি হস্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রক্ষণে।
মাভৈ মাভৈ শব্দ করেন বদনে ॥
একবার যেই জন ডাকে এ পিতায়।
পরিতুষ্ট আলিঙ্গনে করেন তাহায় ॥
কায়মনচিত্তে তাঁর নিলে পদাশ্রয়।
তপনতনয়-ভয় হয় পরাজয় ॥
ভবসিন্ধুবারিবিন্দু কৃপাসিন্ধু আশে।
দীনবন্ধু-পদবিন্দে দীনবন্ধু ভাষে ॥

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবরের শোভা

গগন-শাসন-ভার নিশাকরে দিয়া।
তপন গমন করে, ভুবন ছাড়িয়া ॥
এমন সময়ে শোভে সুন্দর সরসী।
হেরিলে শিহরে অঙ্গ, যায় মনোমসি ॥

সুশোভিত সরোবর হেরে জ্ঞান হরে।
প্রেমপুষ্প ফোটে হৃদে, স্মরে মন স্মরে॥
মহীরুহ রমণীয় বিটপে বিরাজে।
অভিনব কোমল পল্লব তাহে সাজে॥
ললিত লবঙ্গলতা আছে লম্বমান।
সমীরণ সহকারে হয় কম্পমান॥
কুসুম কানন হেরি সুখী আঁখিতারা।
অনুমান হয় মনে, দিনে হেরি তারা॥
মালতী মল্লিকা জাতী কৈরব কোরক।
শেফালিকা স্থলপদ্ম করবী চম্পক॥
টগর গোলাপ বেলা অতসী বকুল।
কামিনী রজনীগন্ধ তোষে অলিকুল॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ মকরন্দময়।
সরোবর মধুগন্ধে আমোদিত হয়॥
সুধীর হিল্লোলে নীর কাঁপিছে নির্ম্মল।
তদুপরি কেলি করে মরাল কমল॥
প্রস্তর প্রস্তুত ঘাট শোভে দুই পাশে।
ভামিনী কামিনীদল জল নিতে আসে॥
আতোর গোলাপ সই মকোর হিতাষি।
ব্যাহান দেখনহাসী গাঁদাফুল মাসী॥
রঙ্গদিদি মিতিন্ প্রভৃতি গঙ্গাজল।
কুম্ভ কাঁখে, হাস্য মুখে, নিতে যায় জল॥
রূপসী কলসী দিয়া ঢেয়াইয়া দিল।
মুখপদ্ম হেরি পদ্ম সলিলে ডুবিল॥
সুরঙ্গে অঙ্গনাগণ বারি পূরি লয়।
পিচলে পড়িয়া কার কুম্ভ ভঙ্গ হয়॥

৮

লোয়ে বারি নারীগণ সারি সারি যায়।
চঞ্চল পবন চারু অঞ্চল উড়ায়॥
কেহ লাজে ঢাকে মুখ, কেহ ধীরে চলে।
মোরে হেরে ঐ মিন্‌ষে হাসে কেঁহ বলে॥
কেহ বলে ওরে হেরে প্রাণ বার হয়।
দীনবন্ধু বলে শুধু জল আনা নয়॥

নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ

যামিনী অধিক হয়, কামিনী কেমনে।
নায়ক আসার আশে থাকে হৃষ্ট মনে॥
আসিবে আসিবে আশা ছিল দিবাভাগে।
এল না এল না কেন, মনে এই লাগে॥
বিনয় বচনে কত কোরেছি মিনতি।
তবু না ভানুর হলো বেগবতী গতি॥
ধরিতে ধরিতে ধৈর্য্য সূর্য্য অস্ত হয়।
নিশি সনে শশী আসি হইল উদয়॥
সুবেশ করিয়া বেশ আসা আশা করি।
এলো এলো এই বোলে বাড়িল শর্ব্বরী॥
কুমুদিনী প্রমোদিনী হেরে শশধরে।
মনে সুখ, হাস্য মুখ, শোভে সরোবরে॥
শত চন্দ্র বিকসিত যার চন্দ্রাননে।
রমণীয় শুভ্র নিশি যার আগমনে॥
যাহার কথনে হয় পীযূষ বর্ষণ।
যারে হেরে পুলকিত হয় দুনয়ন॥
তার আগমন বিনা বিপদ ঘটেছে।
পূর্ণিমায় অমাবস্যা আমার হোয়েছে॥

প্রাণ যায় নাহি পেয়ে, প্রাণ যায় চায়।
চিত্ত-চকোরেন্দু বিনা বৃথা নিশি যায়॥
পলকে প্রলয় হয় যারে না দেখিলে।
অনল জ্বলিয়া উঠে শীতল সলিলে॥
সে বিনে অনন্ত রাত্রি কেমনে কাটাই।
দেহে প্রাণ রাখিবার উপায় না পাই॥
নিরাশ করিয়া নাথ! কেন বধ নারী।
প্রকটিত পুষ্পে কেন ঢাল উষ্ণ বারি॥
কি করি জীবন যায় মানে না বারণ।
বেশভূষা কেশপাশ হয় অকারণ॥
রতিপতি সনে রণ করিবার তরে।
সেনাগণে রাখিলাম সজ্জীভূত করে॥
ফুলবাণ লয়ে করে আইল মদন।
সচকিত সঙ্কুচিত মম সেনাগণ॥
প্রাণপতি সেনাপতি বিনে সীমন্তিনী।
কেমনে কামের রণে হইবে বাদিনী॥
মনমথ মনোমত পাইয়ে সময়।
বধিতে বিরহি-বালা হৃদয়ে উদয়॥
আমার আনীত সেনা পক্ষ যারা ছিল।
বিপক্ষে বিজয়ী দেখে, বিপক্ষ হইল॥
বিপক্ষ বিপক্ষ হোলে বিধাতা বাঁচান।
স্বপক্ষ বিপক্ষ হোলে নাহি পরিত্রাণ॥
যতনে বয়স্যা দিল বেণী বিনাইয়া।
সাপিনী হইল বেণী সময় পাইয়া॥
সিন্দূরে শোভিত তার মস্তকের চক্র।
দংশিল মাথায় মম, ফণা করি বক্র॥

কেন কাটিলাম টিপ কাচপোকা মেরে।
ললাট বিন্ধিল সেই মদনেরে হেরে॥
বহু যত্নে মিসি ঘসি, দন্ত গুণে গুণে।
কালামুখী করে মিসি, সময়ের গুণে॥
ললিত মালতীমালা পরিলাম গলে।
কামফাঁস হোয়ে মাল্য গলা বাঁধে বলে॥
সরল শ্রীখণ্ড-রস লেপিলাম অঙ্গে।
গরল হইল তাহা হেরিয়া অনঙ্গে॥
কারে বা আপন বলি আপনিও পর।
আপনি আপন অঙ্গে তুলিতেছি কর॥
স্বপক্ষে বিপক্ষ, আর উত্তাপ শীতলে।
একের অভাবে হয় দীনবন্ধু বলে॥

রূপক

বসন্তের আগমনে সুমতি ও কুমতি সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন*

দীর্ঘ ত্রিপদী

ফুটিল কুসুমচয়, ভুবন ভূষিত হয়,
নব তরু ললিত লতায়।
কোমল পল্লব শাখা, চন্দন কস্তুরী মাখা,
নবীন কলিকা শোভে তায়॥
কোকিলের কুহু গান, শুনিয়ে মোহিত প্রাণ,
মুদে আসে আপনি নয়ন।
ফুলে করি আলিঙ্গন, চুম্বিয়া অমৃতানন,
গন্ধপূর্ণ মলয় পবন॥

বসন্ত উদয় হয়, অনেকের সুখোদয়,
কেহ কেহ পড়ে দুঃখাগারে।
কাহারো বসন্তকাল, কাহারো বসন্ত কাল,
কালাকাল কাল সহকারে॥
মাধবী মনের সুখে, উঠিল সহাস্য মুখে,
চারচুত গাছ জড়াইয়া।
তরুলতা তরু বিনা, হইয়া জীবনহীনা,
অধোমুখী মাটিতে পড়িয়া॥
পতি প্রেম আলিঙ্গনে, প্রেমানন্দে রামাগণে,
প্রেমপোরা বসন্ত কাটায়।
বসন্তে ছাড়িয়া পতি, যৌবনে যাতনা অতি,
বিরহিণী পাগলিনী প্রায়॥

বিরহিণীর উক্তি

শুন প্রাণ সহচরি, আমি এই বোধ করি,
শীতকাল বুঝি হোলো শেষ।
গায়ে না বসন সহে, দক্ষিণ অনিল বহে,
হিম হারা বারি অবশেষ॥
দেখ সখি সুকৌতুক, শীতে নাহি কাঁপে বুক,
গ্রীষ্ম বটে ঘাম নাহি মুখে।
এ কাল সুখের কাল, থাকে ইহা চিরকাল,
জ্বালা বিনা কাল কাটি সুখে॥

সুমতির উক্তি

পয়ার

সুখের এ কাল সবে, সুখী এই কালে।
শোন প্রাণপ্রিয় সই, পাখী ডাকে ডালে॥

কাকের পালিত পুত্র, এ কালের তরে।
মোহিত করিছে মন, সুমধুর স্বরে॥

কুমতির উক্তি

লঘু ত্রিপদী

এখন সজনি, বিলাস রজনী,
প্রেম সুখে পূর্ণ মন।
মলয় পবন, প্রেম সঞ্চালন,
করিতেছে অনুক্ষণ॥
অনিল ধরিয়ে, দেখ লো গালিয়ে,
প্রেম তার সার ভাগে।
রমণীর মন, দেখিবে তেমন,
পূর্ণ প্রেম অনুরাগে॥

বিরহিণীর উক্তি

দেখ সখি সমীরণে, প্রাণনাথে পড়ে মনে,
প্রবোধ মানে না মনে আর।
মদনের আগমনে, প্রয়োজন প্রিয়জনে,
এত দিনে বিশেষ আমার॥
বল সখি কি কারণ, বিমনা আমার মন,
অকস্মাৎ কোকিলের রবে।
পালক নিষ্ঠুর যার, কুগুণ বর্ত্তায় তার,
সব জ্বালা সবে সই সবে॥

সুমতির উক্তি

মন্দ ভাল, ভাল মন্দ, ভাল মন্দ কালে।
জ্বরে মুখে চিনি দিলে, তেত লাগে গালে॥

বিধি বিধি বিধুমুখি, সম চিরদিন।
কাজের ফেরেতে কাজে; সুগুণবিহীন ॥

কুমতির উক্তি

রমণীর মন, নির্ম্মল জীবন,
জীবন জীবন মনে।
বিনা ও জীবন, বৃথায় জীবন,
অনল কমল মনে ॥
পতিকোলে প্রিয়ে, সুখী হয় হিয়ে,
সরস বসন্ত চর।
বিনা প্রাণকান্ত, বসন্ত অশান্ত,
ফুলে হুল স্বরে শর ॥

বিরহিণীর উক্তি

আমার বিদেশে স্বামী, সহচরি মরি আমি,
দুরন্ত বসন্ত আগমনে।
অবিরত মন্মথ, হৃদয়ে চালায় রথ,
শত সেনা পথ করে মনে ॥
মনে করি প্রাণধনে, আসিতে না দিব মনে,
ছেদ করি ভাবনার ডুরি।
বারণ কি মানে মনে ভাবে মন প্রতি ক্ষণে,
মোহনের মুখের মাধুরী ॥

সুমতির উক্তি

বসন্তে অঙ্গনা সনে অনঙ্গের রণ।
পতিরূপ শস্ত্রে জয়ী হয় রামাগণ ॥

সংগ্রামেতে শস্ত্রহীন হইলে দুর্গতি।
আশাবর্ম্ম ধৈর্য্যচর্ম্ম ধরে সেই সতী ॥

কুমতির উক্তি

মদনের বাণ, হীরক সমান,
চর্ম্ম বর্ম্ম করে ভেদ।
রক্ষ অস্ত্র ছেড়ে, আগে গেলে বেড়ে,
বাড়াবে মনের খেদ ॥
যৌবন তটিনী, তরণি কামিনী,
বসন্ত তুফান তায়।
নায়ক নাবিকে, ছাড়িয়া তরিকে,
আশা তৃণে রাখা দায় ॥

বিরহিণীর উক্তি

আসার আশায় সই, প্রাণ আর থাকে কই,
তনু দহে অতনুর শরে।
ফুটিল যৌবন কলি, না আইল প্রাণ অলি,
মধু মিশে গেল কলেবরে ॥
কামের করাল কর, বিস্তারিত নিতে কর,
শর হানে বিলম্ব দেখিলে।
রতিপতি পায় ধরি, নয় আমি প্রাণে মরি,
পঞ্চ শরে জীবন দহিলে ॥

সুমতির উক্তি

আহা মরি প্রাণ সই, দুখে ফাটে বুক।
নাহি চাষা চায় চাষ, এ বড় কৌতুক ॥
বিনা কর পঞ্চশর বধিবেক প্রাণ।
কামে স্তুতি কর গিয়া, যদি পাও ত্রাণ ॥

কুমতির উক্তি

বৃথা কেন যাবে, কোথাও না পাবে,
"ভাতার দাদার মত"।
যে কর পাইবে, সে কেন ছাড়িবে,
স্তুতি শুনে গোটা কত ॥
সম্পত্তি তোমার, অশেষ প্রকার,
দেখিবে রতির বর।
যৌবন-রতন, করি বিতরণ,
দিলে দিতে পার কর ॥

বিরহিণীর উক্তি

কি করি সুমতি বল, প্রবল বিরহানল,
জল জল কোরে প্রাণ যায়।
কুমতির পূর্ণ মতি, ভাল বটে বুদ্ধিমতী,
হাতে হাতে দেখায় উপায় ॥
ও প্রাণ কুমতি সই, দেখ কত জ্বালা সই,
কথা কও নিকটে বসিয়ে।
রাখিব তোমারি বাণী, হয় হবে মানে হানি,
পাণি পান করিব ডুবিয়ে ॥

সুমতির উক্তি

বসন্তে অনঙ্গ জ্বরে বিরহ বিকার।
পিপাসায় প্রাণ যায়, নাহি প্রতীকার ॥
গোপনে জীবন পানে জীবনসংশয়।
আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, আরও তৃষ্ণা হয় ॥

কুমতির উক্তি

বিরহের জ্বরে, অবশ্যই মরে,
খায় বা না খায় বারি।
জলে মরা যায়, জ্বলে মরা যায়,
সার কথা শুন নারি॥
থাকিতে উপায়, সহা নাহি যায়,
পঞ্চ শরের আগুন।
ঐ শোন কাণে, ফুলের বাগানে,
ষট্‌পদ গুণ গুণ॥

সুমতির ক্রোধোক্তি

কুমতি কুমতি আর দিস্‌নে ভুবনে।
বিরহে মরেছে কেবা, বিহার বিহনে॥

কুমতির উত্তর

ও সই সুমতি, আমারি কুমতি,
গাল দেও করে ছল।
কামজ্বরে নারী, পান করি বারি,
মনোদুখি কেবা বল॥

বিরহিণীর উক্তি

ছি ছি কেন ঘরে ঘরে, মর মিছে দ্বন্দ্ব করে,
সন্দ হয় পরে প্রাণ দিতে।
স্মরশরে জ্বর জ্বর, জ্বলিতেছে কলেবর,
অবশাঙ্গ না পারি বসিতে॥
দুয়ে হয়ে এক মন, দ্বন্দ্ব করি নিবারণ,
বল সই সুখের উপায়।

দীনবন্ধু বলে দ্বন্দ্ব অন্ত হোলে হবে মন্দ,
এইরূপে যে কদিন যায়॥

['সংবাদ প্রভাকর', ২৩ মার্চ ১৮৫২]

বসন্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ

হ্রস্ব ত্রিপদী

দেখিয়া বসন্ত, রমণী অশান্ত,
কান্ত কান্ত মুখে বলে।
দুরন্ত মদন, হৃতান্ত শমন,
কাল সম স্বীয় কালে॥
বিরহ অনল, না ছিল প্রবল,
হেমন্তের হিম জলে।
শীতের বিরহে, বিরহ না রহে,
অহরহ বহ্নি জ্বলে॥
যৌবন-যাতনা, সহজে সহে না,
সমান যাতনা সদা।
তাহাতে মদন, না শুনে বারণ,
জ্বালিছে আগুন সদা॥
কহিছে রমণী, শুন লো সজনি,
দুঃখের কাহিনী মম।
এ সুখ বসন্তে, আছি বিনা কান্তে,
কান্তহীনা কান্তা সম॥
বন্ধি করে ফুলে, দেশান্তরে ভুলে,
আছে প্রাণ ছাড়ি দেহ।

মরি মরি মরি, শুন সহচরি,
বিনা দেহে প্রাণ দেহ ॥
দেহ কি কখন, থাকে গো চেতন,
সে ধনে নিধন হয়ে ।
আশারি কারণ, আছে এতক্ষণ,
আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তার আসা আশা, ক্ষুধা বা পিপাসা,
সব আশা আশা তারি ।
শয়নে, স্বপনে, মনের নয়নে,
তাহারি বদন হেরি ॥
কিন্তু সখী আর, প্রাণ রাখা ভার,
আশা তৃণ করি ভর ।
বসন্ত শ্রাবণে, জাহ্নবী যৌবনে,
তরঙ্গ প্রবলতর ॥
তরুণী তরণি, বিপথগামিনী,
তারক নাবিক বিনে ।
অনিবার বারি, নিবারিতে নারি,
উথলিল কানে কানে ॥
কোকিলের ধ্বনি, শুনি কহে ধনী,
নীরদ বিরদ ডাকে ।
কর হে দর্শন, হয় নিদর্শন,
কাল মেঘে শূন্যে ডাকে ॥
ভ্রমরা গুঞ্জরে, মিষ্ট মধু স্বরে,
বলে ওরে ওরে একি ।
বায়ুবেগ অতি, নাহি আর গতি,
মহাশব্দে আসে সখি ॥

ভ্রমরা কোকিল, মলয় অনিল,
সকলি প্রলয় করে।
মাতঙ্গ অনঙ্গ, দেখায় আতঙ্গ,
প্রাণ সাঙ্গ পঞ্চ শরে॥
বিচ্ছেদ যাতনা, অনলের কণা,
সতীতে দহিয়ে যায়।
মিলন সলিল অভাবে অনিল
আহুতি দিতেছে তায়॥
সঙ্গী সঙ্গে নাই, কোথা বল যাই
প্রাণ পাই প্রাণ পেলে।
অসহ্য যন্ত্রণা, আর যে সহে না,
প্রাণ পাই প্রাণ গেলে॥
একে তো অবলা, তাহে কুলবালা,
পাগলা হেরিয়ে অরি।
পিঞ্জরের পাখী, পিঞ্জরেতে থাকি,
কভু না বাহিরে হেরি॥
এত দিন পরে, বুঝি দেখা পরে
দিতে হয় মম ভাগ্যে।
করিয়া মিনতি, রতিপতি স্তুতি
করি স্মরি শিব দুর্গে॥
মম প্রাণকান্ত, শুন রতিকান্ত,
বহু দিন নাই সাতে।
সেই সে কারণ, বিলম্ব এখন,
তব করে কর দিতে॥
আর অকারণ, কর না প্রেরণ,
যমদূত দূতগণে।

তারা হেথা এসে, অনায়াসে নাশে,
পাপ নাহি করে মনে ॥
যদি বল আন্, তারা ধরে কাণ,
অপমান পরিপাটি।
"কাছারীর পাক্, করে মহা-জাঁক"
রক্ষা নাই পেলে চিটি ॥
শুন রতিবর, দিতে করে কর,
নারী নারে বিনা নর।
প্রাণপতি ঘরে আইলে তোমারে
একেবারে দিব কর ॥
মৃগের বচনে, ব্যাঘ্রে কোন্ খানে,
ভক্ষণে বিরত রয়।
দুরন্ত মদন, সে কি নিবারণ
কথায় কখন হয় ॥
শুনি হেন বাণী, তখনি অমনি
ধনু লয় করে তুলে।
পূরিয়া সন্ধান, লয়ে পঞ্চ বাণ,
হানিলেক বক্ষঃস্থলে ॥
উচ্চৈঃস্বরে ধনী, করে মহাধ্বনি,
প্রাণ যায় প্রাণ যায়।
মুমূর্ষু হইয়ে, কিছু কাল রয়ে,
পতি প্রতি কিছু কয় ॥
কোথা প্রাণনাথ, বধে রতিনাথ,
দেখ আসি অধীনীরে।
মদনের বাণ, অগ্নির সমান,
বিন্ধিয়াছে এ শরীরে ॥

অগ্নিশিখামুখে, দহে প্রাণ দুঃখে,
নাচার বিচার করি।
যাই ঘর ছাড়ি, নয় দেহ ছাড়ি,
যায় প্রাণ মরি মরি ॥
আমার যন্ত্রণা, করিতে বর্ণনা,
মন্ত্রণা করেন ফণী।
নাহি পারে পরে, চিন্তয়ে অন্তরে,
রাগে ত্যাগে দীপ্ত মণি ॥

জনক জননীর স্নেহ

সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ-করুণাবরুণাগার-নির্ম্মল-নির্ব্বিকার-সর্ব্বসদগুণা-ধার-পরম-পবিত্র-অনাদ্যনন্তদেব-মণ্ডিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় সৃষ্টিবস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা সেমুষী সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমূহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ করিতেছে। আকাশ-বিহারী সহস্র-রশ্মিধারী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রজ্বলিত প্রভায় মেদিনীমণ্ডলোজ্জ্বল দেখিলে এবং প্রবল-পবন-বেগোন্মত্ত উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমাকুল সাগরাবেক্ষণ করিলে কোন্ ব্যক্তি রবিরত্নাকরকর পরমেশ্বরকে সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া না স্বীকার করিবে। সুশীতল সুধাকরের নির্ম্মল চন্দ্রিকালোকেতে এবং প্রস্ফুটিতসরোবরজজাত-সৌরভা-মোদিত সমীরণ আঘ্রাণে সকলেরই মনের নয়নোপরি শশাঙ্ক-পঙ্কজাকর পদ্মযোনির নির্ম্মলতা এবং পূর্ণ গৌবব প্রদীপ্ত হয়। জগন্মণ্ডলে জনসমাজে জনক জননী সন্তানের প্রতি যে উৎকৃষ্ট

কোমল স্নেহ প্রকাশ করেন সে কেবল মাতার মাতা, পিতার পিতা, বিশ্বপিতার করুণানুরূপ। দয়ার্ণব পরমাত্মা যেমন প্রেমাদরে এবং অবিরক্ত চিত্তে সীমাশূন্য জগৎসংসার প্রতিপালন করিতেছেন তদ্রূপ জনক জননী সন্তান সন্ততির সুখসম্পাদনে সানন্দচিত্তে সতত রত আছেন। জননী দশ মাস দশ দিন উদরাম্বরে শশধর ধারণ পুরঃসর জীবনঘাতক প্রসববেদনা স্বীকারে পুত্রপ্রসবানন্তর প্রজাবতী হইলে এতাধিক ক্লেশে কাতরা হওয়া দূরে থাকুক প্রাণাধিক প্রাণ পুত্রের সুখসচ্ছন্দসংস্থাপনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। জননী স্বীয় আমোদ প্রমোদ এবং শারীরিক সুখ মুহূর্ত্তের নিমিত্তও মনে করেন না, পরম আমোদাস্পদ কোমল ক্রোড়স্থ কুমারের কোমলাঙ্গ পরিষ্কার করিতে সতত সুরতা, এবং আপনাশন বিস্মরণে তদুপযোগী সুপথ্যানুসন্ধান করিয়া তাহাকে পরিতোষ করিতে পারিলেই আপনাকে পরিতুষ্টা বোধ করেন। মাতা যদ্যপি কোন সময়ে সমিষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তৎক্ষণাৎ জীবনাপেক্ষাও প্রিয়তম সন্তানের নিমিত্ত সযত্নে সংস্থান করিয়া রাখেন, যদ্যপি ফল ভক্ষণ করিতে করিতে কোন ফল আস্বাদনে সাতিশয় সুমধুর বোধ হয় তবে সহসা সেই ফল শিশুর বদনে উত্তোলন করিয়া দেন। জননী সন্তানগণের কোমল হৃদয়ের জীবিত ভূমিতে করুণা-বচন-রূপ বারি সিঞ্চন করিয়া ধর্ম্মের বীজ বপন করেন, যাহা সময় সহকারে জ্ঞানারুণকিরণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাদিগকে যৌবন এবং স্থবির অবস্থায় পরম পদার্থরূপ ফল প্রদান করে। বালক বালিকা-নিচয়ের নির্ম্মলান্তঃকরণে পরমপুরুষের ভয় ভক্তি গৌরব সঞ্চার করিয়া দেওয়াই গর্ভধারিণীর স্বর্গীয় স্নেহের প্রধান চিহ্ন। কোমল অথচ দৃঢ় পিতৃস্নেহের প্রাদুর্ভাবে পিতার মন সতত চঞ্চল, কখনই সুস্থির হইতে পারে না। মহামায়ার কেমন মহিমা তাহা কে

বর্ণনা করিতে পারে। উষাকালে মলিনবদনা তারাগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডুবর্ণাবৃত নিশানাথকে অস্তাচলচূড়াবলম্বী দেখিয়া তরুণ অরুণ উদয়াচলে উদয় হইলে সংসার আশ্রম কি অলৌকিক শোভা সংগ্রহ করে। এতৎকালে জননীর করুণাপূর্ণ মঙ্গলালয় ক্রোড়ে সুষুপ্ত শিশুদল জাগরিত হইয়া বারম্বার পীযূষাভিষিক্ত পিতানামোচ্চারণ করতঃ পিতার সন্নিকটে আগমনানন্তর তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে, কেহ কেহ বা পরস্পরে দোষবর্জিত এবং দ্বেষহীন বাল্যলীলায় প্রবৃত্ত হয়, কেহ কেহ বা পিতার উপরে মুখঘর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনোগত অভিলাষ অন্যকে দূরে রাখিয়া পিতার পবিত্র ক্রোড়াম্বুজে একাকী স্থিত হয়। এমন রমণীয় সুখজনক দৃশ্য দর্শনে পরম পরাৎপর করুণাসাগর বিশ্বপিতার করুণাকীর্ত্তনে মন বিমনা হইয়া নিযুক্ত হয়, বোধ হয় যেন জ্যোতির্মধ্যচারী চারুচন্দ্র ভ্রমণবর্ত্মের ভ্রমক্রমে সপরিবারে প্রভাতকালে ভূতলে পতিত হইয়া এমন মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছেন। পুত্রপুত্রীপুঞ্জের প্রতিপালনার্থে পিতা যত ক্লেশ সহ্য করেন তাহা বর্ণনাতীত। মায়ারূপ অন্ধকারে লোচনযুগল আচ্ছাদিত হইলে নানাবিধ আপদ্-বিপদ্-সমাকীর্ণ দেশদেশান্তর পর্য্যটন, জলধিপোত সহযোগে সমুদ্রে সন্তরণ, পরাধীনতা এবং অনিয়মিত কর্ম্মের বিফলসমূহ নরের নেত্রগোচর হয় না। সন্তানগণের সুখসম্ভোগার্থে পিতা স্বদেশ পরিহার পুরঃসর বিদেশ গমন করিয়া কায়িক পরিশ্রমে অর্থার্জন করিতে কালহরণ করেন, অসীম অতলস্পর্শ করাল কলকলশব্দাক্রান্ত সিন্ধুকে বিম্ববিন্দুজ্ঞানে নির্ভয়ে তদুপরি তরণি বহনপূর্ব্বক বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, পরের নিকটে বেতন গ্রহণ করিয়া তাহার নানারূপ ভর্ৎসনা, বিজাতীয় যন্ত্রণা, এবং পীড়ন সহ্য করিতে দুঃখ বোধ করেন না এবং কখন কখন

গত্যন্তর বিধায় মলিম্লুচাচারানুগামী হইতেও পরাঙ্মুখ নহেন। তনয় তনয়ার পীড়া উপস্থিত হইলে পিতা মাতার মনে যে পীড়া জন্মে তাহা বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাঁহাদিগের যেন মহাপ্রলয়ের কাল উপস্থিত। যত দিন পর্য্যন্ত সুত সুতার স্বাস্থ্যাবস্থার অনাগমন থাকে তত দিন চিন্তারূপ দাবানলে তাঁহাদিগের দেহবনে মনমৃগ দগ্ধ হইতে থাকে, তাঁহাদিগের ভাবার্ত্তচিত্ত হেতু ক্ষুধা পিপাসার একেবারে বিরহ হয়, সজল নয়ন হইতে নিদ্রাদেবী অন্তর্হিত হন এবং অনুক্ষণ হুতাশনরূপ বরাহ কর্ত্তৃক অশ্রুতে আর্দ্র হৃদয়মৃত্তিকা খনন হইতে থাকে। যদ্যপি করুণাময়ের কৃপানুকূল্যে অঙ্গজাঙ্গজার জীবন রক্ষা হয় তবে পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু তদ্বিপরীতে আত্মজাত্মজার জীবন সহিত জনক জননীর জীবন ধ্বংস হইয়া যায় এবং অসম্বরণীয় গভীর শোকসাগরে নিলীন হইয়া যাবজ্জীবন জীবন্মৃতপ্রায় সময় ক্ষেপণ করেন। পিতা মাতা সন্তান সন্ততির প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ করেন তাহা প্রাকৃতিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ এতৎ স্নেহ জনক জননীর হৃদয়ে স্বভাবতঃই উদয় হয়। তবে যে কোন কোন মহাশয় বলেন, প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় তাঁহাদিগের স্নেহের সঞ্চার হয়, সে সম্যক্ প্রকারে অমূলক, কারণ অনেকানেক ধনশালী কুবেরতুল্য কোষাধিপতি দম্পতীর কিঞ্চিন্মাত্র ভারও পুত্রোপরে নির্ভর করে না, তজ্জন্য কি ঐ দম্পতী সন্তান সন্ততি প্রতি স্নেহ প্রকাশে বিরত হন? নাকি অন্যান্য পিতামাতা অপেক্ষা তদুভয়ের স্নেহের স্বল্পতা জন্মে? সচরাচর অস্মদাদির শ্রবণ-গোচর হয়, অনেকানেক জনকজননী পুত্রের কথোপকথনোপলক্ষে কহিয়া থাকেন, "পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, পুত্রটি দীর্ঘজীবী হইয়া যে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাই ভোগ করুক।"

আর দেখ, বহুসংখ্যক বালক অপকৃষ্ট মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাবে এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অপবিত্রতা হেতু পরমগুরু জননীর প্রতি অনাদর এবং অহিতাচার করে, তন্নিমিত্ত কি মাতা কুসন্তানের অনিষ্ট চেষ্টা করেন? না অশ্রগুনীয় স্নেহরজ্জু ছেদ করিতে উদ্যতা হন? তাঁহার নির্ব্বিকার মন সন্তানের বিপক্ষে কখন বিকার-প্রাপ্ত হয় না, এবং ইহা কাহার না বিদিত আছে?

"কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়—"

যদ্যপি জনক জননীর স্নেহ প্রাকৃতিক না হইবে, তবে কি নিমিত্ত বিহঙ্গমদল এবং পশুকুল, যাহারা ভাবি-ভাবনায় কখনই উৎকলিকাকুল হয় না, এবং প্রত্যুপকারের প্রসঙ্গও জানিতে পারে না, অবিরত শাবকগণকে লালন পালন করিতে আসক্ত থাকে? তাহারা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে, শাবকসমূহ স্বাধীন হইলে তাহাদিগের পিতা মাতাকে প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সহিত কোন সম্পর্কও রাখে না, তবে কি নিমিত্ত পশুপক্ষীরা শাবকগণের প্রতি এতাধিক স্নেহ প্রকাশ করে? এতাবৎ অস্মদাদির বোধগম্য হইতেছে, জনক জননীর স্নেহ প্রকৃতির শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। দেখ, অন্ধ খঞ্জ বধির এতত্রিবিধ-রোগাক্রান্ত সুত প্রসব হইলেও প্রসূতির কখন সন্তানের প্রতি হতাদর হয় না, জননীর স্নেহ অসীম এবং লেখনাতীত। যদিচ প্রতিদিন এক এক ফোঁটা বারি উত্তোলন করিতে করিতে ভুবনমণ্ডলাধার মহাসাগরের কালক্রমে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা, তথাপি চিরকাল যদ্যপি পাতালাধিপতি জননীর স্নেহ বর্ণন করেন, তাহা হইলেও আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা হয় না, তবে জননীর করুণাসঙ্গীত করিতে অস্মদাদির ক্ষমতা আছে, এ কারণ নিম্নভাগে কোমল পয়ারচ্ছন্দে সমস্ত স্নেহ বিরচন করিলাম।

পদ্য

ভূলোক ভাবিয়া দেখ, সরল অন্তরে।
জননীর কিবা স্নেহ সন্তান উপরে॥
আহা মরি মার মায়া করিতে রচনা।
মা মা মা মা বলি মুখে, হইয়ে বিমনা॥
দয়াময় অনুরূপ আপন দয়ার।
জগতে জননীস্নেহে করেন প্রচার॥
আলোচনা করি সাধু, দেখ একমনে।
কত দুখে পালে মাতা সন্তান রতনে॥
উদর-কমলে সুত করিয়া ধারণ।
দশ মাস দশ দিন করেন বহন॥
অশেষ যাতনা পান গর্ভের কারণ।
অরুচি বমন হাই অঞ্চলে শয়ন॥
ভয়েতে শিহরে অঙ্গ বলিব কেমনে।
প্রসববেদনা সম কি আছে ভুবনে॥
বিজাতীয় যাতনায় জীবনসংশয়।
প্রসবান্তে পুনর্জ্জন্ম সর্ব্বলোকে কয়॥
প্রসবের পরিতাপ, প্রজা তা না মানে।
চঞ্চলা চপলা প্রায় দেখিতে সন্তানে॥
উঠিতে অচলা তবু স্নেহের কারণ।
সন্তানে দেখেন চেয়ে ফিরায়ে লোচন॥
সুতচন্দ্র হেরি হয় জ্যোতি মনসুখ।
সহসা মোচন মসী শারীরিক দুখ॥
কোলে লয়ে জননীর হৃদয় জুড়ায়।
শরৎ আকাশে যেন শশী শোভা পায়॥

সানন্দে হৃদয়ে মাতা সাতিশয় সুখে।
পীযূষপূরিত স্তন স্নেহে দেন মুখে॥
কোমল জননী কোল নিরমল বাস।
পবিত্র, ব্যসনহীন, নাহি কোন ত্রাস॥
অভাব অভাব সব, অশোক আলয়।
ইহলোকে ইডেন-নিকুঞ্জ মনে লয়॥
সদানন্দে শোভা শিশু, করে এই কোলে।
তোষে মায় ম, ম, বলে আদো২ বোলে॥
আহা মরি শিশু যদি হাসে এক বার।
উথলয়ে মার তবে সুখপারাবার॥
যতনে রতনে মাতা করেতে নাচান।
চুম্বিয়া কমল মুখ, বুকে দেন স্থান॥
সময়ে সময়ে সুখে, সকালে বিকালে।
ঝিনুকে বাজায়ে বাটি, দুদ দেন গালে॥
মুছায়ে করেন শিশু-অঙ্গ মণিময়।
স্বর্ণ অঙ্গে ধূলা মার প্রাণে নাহি সয়॥
ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত জননী যাদুরে।
কথায় করেন গান ঘুম আনা সুরে॥
দোলায়ে বলেন মাতা, শুনে ঘুম পায়।
"আয় রে আমার গোপালের ঘুম আয়॥"
সন্তানের সুখে সুখী সতত জননী।
তার দুখে অন্ধকার দেখেন ধরণী॥
অপার করুণা মার, সিন্ধু-পরিমাণ।
কোমল নির্ম্মল অতি, কৌমুদী সমান॥
বিরচন বিবরণ মায়ের মায়ার।
করিতে শকতি নাই জগতে কাহার॥

রূপক

মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান*

পয়ার

কামিনী যামিনীযোগে, শয্যার উপরে।
নায়ক সহিত নিদ্রা, যায় অকাতরে॥
নীরব ভুবনময়, নাহি বাক্য রব।
পশু পক্ষী যক্ষ নর, সব যেন শব॥
ধ্বনি মাত্র কুক্কুরের, খেউ খেউ ডাক।
মাঝে মাঝে হৈ হৈ, প্রহরীর হাঁক॥
অবশেষে রজনীর, অধিকার শেষ।
উষারাজ আসিতেছে, করি রাজবেশ॥
কোকিল নকিব আগে, করিছে গমন।
কুহু কুহু রবে ব্যক্ত, রাজ আগমন॥
বায়স বাজায় ডঙ্কা, আপনার স্বরে।
চোক্ গেল চোক্ গেল, তূরী ভেরী পরে॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সুগন্ধে মোদিত।
কস্তুরি চন্দন চুয়া, ভূপতি বিহিত॥
আলোময় সিংহাসন, রাজা বসে তায়।
মৃদু হাস্য মুখে পদ্ম, চামর ঢুলায়॥
জগতে ঘোষণা হয়, রাজ আগমন।
ভূপতি সেবায় যুক্ত, হয় জগজ্জন॥
অভিমানে মুদিত, হইল কুমুদিনী।
জাহ্নবীর স্নানে যায়, যতেক কামিনী॥
শাটি ঠেটি নামাবলী, লয় সমাদরে।
ঢাকিল কনক অঙ্গ, বনাত চাদরে॥

কেহ বলে মেজ্ দিদি, যেতে চেয়েছিল।
ডাক্ রে সোণার মাসী, বেলা যে হইল॥
আতোরে আতোরে ডাকে, মকরে মকরে।
মিতিনে মিতিনে ডাকে, আদরে আদরে॥
সই বলে সই সই, আয় আয় আয়।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজলে, গঙ্গাজলে যায়॥
চলিল ললনাশ্রেণী, আনন্দ অপার।
বিনা সূত্রে গাঁথা যেন, কুসুমের হার॥
অবলা সরলা দল, বিদ্যাবুদ্ধিহীনা।
অন্ধকারে ব্যাপ্ত মন, জ্ঞানারুণ বিনা॥
শিক্ষাযন্ত্রে মনক্ষেত্র, না হোলে কর্ষণ।
যত্নবারি, তদুপরি, না হোলে বর্ষণ॥
অহিত কল্পনা কাঁটা, গাছ তাহে হয়।
শিক্ষা বিনা অবশ্যই, গাদা হয় হয়॥
বারণ গমনে চলে, যত বামাগণ।
পরস্পরে হয় নানা, কথোপকথন॥
বিবেক নহেক সূক্ষ্ম, স্থান স্বল্প মনে।
অসীম পরম অর্থ, ভাবিবে কেমনে॥
রন্ধনের কথা মাত্র, কথা উপলক্ষ।
ইহ লোকে সুখ ভিন্ন, নাহি অন্য লক্ষ্য॥
কেহ বলে হে গো দিদি, শোন্ দেখি চেয়ে।
শ্বশুরের বাড়ী নাকি, গেছে তোর মেয়ে॥
কবে বা আনিলি হেথা, না জানিতে পারি।
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি, রেখে দিন চারি॥
আহা বন্, কি বলিব, দুরন্ত জামাই।
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই॥

কলিকালে ছেলে পিলে, যা বলে তা করে।
যে কপাল বন্ মোর, যদি বিয়ে করে॥
সই মা বলিয়া ডাকি, বলে অন্য জনে।
কি দ্রব্য পাঠালে সয়া, পোষড়া পার্ব্বণে॥
আহা বাছা কি বলিব, তারা তো দিয়েছে।
আমি যে পারি নে দিতে, তবু মাস গেছে॥
মেয়ের দিয়েছে শাটি, সিন্দূর দোলাই।
সন্দেশ কমলা নেবু, তিল গুড় ছাঁই॥
থাকির মা বলে ডাকি, বলে এক মেয়ে।
বল কি গহনা তোর, পেলে ছোট মেয়ে॥
কোথা বা গহনা দিদী, খানেক দুখান।
জামাই বলেছে সবে, ভাল গুণমান্॥
আমাদের ওঁরা, দিয়াছেন পাঁচনরী।
ঝুম্‌কা তাবিচ নত, পঞ্চম গুঁজ্‌রী॥
সিঁতি বাজু বালা মল, তারা দেছে এই।
যার হাতে পোড়েছেন, বেঁচে থাক্ সেই॥
মেয়ের কপাল না তো, বাঁদীর কপাল।
হইবে অতুল সুখ, ফেরে তো কপাল॥
এইরূপ নানারূপ, অপরূপ কথা।
ক্রমে ক্রমে উপস্থিতা, বাপীতট যথা॥
দুরাচার পাপী নর, পথে পথে ফেরে।
কত কথা কয় তারা, নারীগণে হেরে॥
মাতৃবৎ পরদারা, তারা নাহি মানে।
তারা-বাণ হানে তারা, মানিনীর মানে॥
কুলের কামিনী দেখে, যার মন টলে।
অজাগোত্রে ভুক্ত সেই, সর্ব্বলোকে বলে॥

অপর রাখিয়ে বস্ত্র, পাড়ের উপরে।
আস্তে আস্তে জলে যায়, কাঁপে থরে থরে॥
উহু উহু বড় শীত, নাবে আঁটু ধোরে।
ঝুপ করে পোঁড়ে ডুব, দেয় টুপ করে॥
কমলে কোমল অঙ্গ, রামা ডুবাইল।
বিমল কমল যেন, কমলে ভাসিল॥
গামোছার কত পুণ্য, পূর্ব্বজন্মে ছিল।
বিধুমুখী বিধুমুখে, আপনি তুলিল॥
সারি সারি বারি-ক্রিয়া, করে যত রামা।
উদ্ধার কর মা গঙ্গা, ভোগ-মোক্ষ-ধামা॥
আহ্নিক পূজার পর, বস্ত্র পরিধান।
গাম্ছা মুড়িয়া লয়, ভিজা বস্ত্রখান॥
বাম হাতে ভিজা বস্ত্র, নামাবলী গায়।
বনাত চাদর শাল, যেই যাহা পায়॥
চলিল চঞ্চল পদে, চপলার প্রায়।
অরুণ উদয় হয়, আয় আয় আয়॥
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায়, হোয়ে ছাড়াছাড়ি।
বাড়াবাড়ি কাজ নাই, এই বাড়াবাড়ি॥

['সংবাদ প্রভাকর', ২৬ জানুয়ারি ১৮৫২]

রূপক

চন্দ্র*

পয়ার

দিবা অবসানে রবি, তাপিত অন্তর।
জুড়াইতে যায় কায়, জলধিভিতর॥

মনোহর শশধর, উদয় গগনে।
"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়," বলে শিশুগণে॥
তারামাঝে তারাপতি, শোভে অপরূপ।
উপমায় নাহি হয়, সেরূপ স্বরূপ॥
নয়ন ফিরাতে নারি, হেরে একবার।
স্ফাটিকের স্তম্ভে যেন, মল্লিকার হার॥
পুলকিত হয় অঙ্গ, চন্দ্রের কারণ।
এ কারণ ধ্যান করি, চন্দ্রের কারণ॥
পরিপূর্ণ কলানিধি, কর সুকোমল।
সরল ধবল কান্তি, অতি নিরমল॥
কৌমুদী মেদিনী পরে, ঘুমায়ে রয়েছে।
দুধের সাগর যেন, উথলে উঠেছে॥
নিশাকর-করে নিশা, পরিতুষ্টা অতি।
পতি-প্রেমালাপে যথা, তুষ্টা হয় সতী॥
শশি-সুশোভিতা রাত্রে, বন ভাল সাজে।
স্বভাবের স্থির শোভা, তাহাতে বিরাজে॥
তরু'পর নিশাকর, দান করে কর।
চিক্ চিক্ করে পাতা, নাচে মনোহর॥
সুধাকর হোতে সুধা, ক্ষরে সরোবরে।
কুমুদিনী হাস্যমুখী, প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রান্তরে পথিক যায়, তাপিত তপনে।
শান্ত হয় শ্রান্তি যায়, বিধু বিলোকনে॥
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ, বসি তৃণাসনে।
স্নিগ্ধতনু, মুগ্ধমন, চাঁদের কিরণে॥
বিধুমুখী, বিধুমুখে, পড়ে বিধুকর।
সোণায় সোহাগা দিলে, যেমন সুন্দর॥

সুধার আধার শশী, অম্বরে আবাস।
প্রভায় প্রদীপ্ত করে, অবনী আকাশ॥
এত রূপ গুণ তবু, কলঙ্ক কারণে।
সময়ে সময়ে পড়ে, দানব দশনে॥
এইরূপ রূপ গুণে, ভূষিত যে জন।
বল তার ফল কিবা, বিফল জীবন॥
যেই জন পাপ হেতু, কলঙ্কী হইবে।
পরিণামে অবশ্যই নরকে যাইবে॥

['সংবাদ প্রভাকর,' ৪ মে ১৮৫২]

রূপক

দম্পতি-প্রণয়। বিজয় কামিনী

কাঞ্চননগরাধিপ রাজা সদাশয়।
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয়॥
অপরূপ রূপ তাঁর সুগুণ অশেষ।
ধর্ম্মশীল নীতিবেত্তা, নাহি পাপলেশ॥
বেড়েছে বয়স তবু নাহি করে বিয়ে।
সকলে বিনতি করে বিয়ের লাগিয়ে॥
বয়স্যগণের সহ একদা বিজয়।
সদালাপ করিতেছে, আনন্দ-হৃদয়॥
দোষহীন পরিহাস কথায় কথায়।
বিবাহের কথা শেষ উঠিল তথায়॥
সুরসিক সুপণ্ডিত বয়স্য জনেক।
বিজয়ে বিয়ের তরে বলিল অনেক॥

ত্রিপদী

নরের সুখের তরে, দয়াময় দয়া করে
স্বজিলেন ভুবনমোহিনী।
মনোহরা এ প্রমদা, বহু গুণে বিশারদা,
শশীপদ্মে লাজ-বিধায়িনী॥
আলাপন অধ্যয়ন আরাধন উপার্জ্জন
অশন বসন আভরণ।
কিছু নহে মনোনীত, বিনা হস্তে হোলে নীত
রমণীয় রমণীরতন॥
বিনা বাসে কমলিনী, বাসহীনা কমলিনী,
শোভাহীনা সুশোভিত পুরী।
সুখে মুখ হয়ে মূক, বৃথা দুঃখে দহে বুক,
মন-সুখ মন করে চুরি॥
বিধিবিধ পরিণয়ে, কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
লোকযাত্রা সুখে অনুষ্ঠান।
ধর্ম্মের উন্নতি হয়, পরিতাপ পরাজয়,
ফুলে পূর্ণ প্রণয় বাগান॥
উপাসনে সোণামণি, করে সদা চিন্তামণি,
পতি সনে দেবালয় যায়।
ভোজনাদি বিভূষণ করে সব আয়োজন,
প্রিয়জনে প্রয়োজন যায়॥
পথে পান্থ হয় শ্রান্ত, মনে মনে মন শান্ত,
কান্তা করে সান্ত্বনা উপায়।
স্বামীর সুখের তরে, শীতে বারি উষ্ণ করে,
তালবৃন্ত নিদাঘে যোগায়॥

গৃহশূন্য হয় যার, দশ দিক্ অন্ধকার,
সংসার শ্মশান অনুমান।
পোড়ে মন শোকানলে, কারে কিছু নাহি বলে,
চলে বসে পাগল সমান॥
অতএব নিবেদন, শুন সব বন্ধুগণ,
বিজয়ের বিবাহ উচিত।
হোলে পরে অনুমতি, রূপবতী গুণবতী
আনিবার করিব বিহিত॥

পয়ার

বিজ্ঞবর সুপণ্ডিত বিজয় রাজন।
প্রফুল্লবদনে পরে করে নিবেদন॥
পরমেশ-অভিপ্রেত পরিণয় বটে।
প্রণয়িনী প্রয়োজন, যদি ভাল ঘটে॥
জীবের প্রধান কাজ দেব আরাধন।
নিবিষ্ট হইবে তায় হোয়ে একমন॥
তাঁহার ব্যাঘাত যদি নারী লোয়ে হয়।
কোনমতে বিয়ে করা উপযুক্ত নয়॥
তত কাল বিভু-আজ্ঞা করিবে পালন।
যত কাল তাঁর কার্য্য না হয় হেলন॥
অচির দম্পতি-সুখ অনিত্য ধরায়।
তার হেতু নিত্য সুখ বল কে হারায়॥
তবে যদি মনোমত পাই সুলোচনা।
গুণবতী ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা॥
দ্বিতীয়া বলিয়া তারে নিতে ইচ্ছা হয়।
মরণান্তে যার সহ থাকিবে প্রণয়॥

বিজয়ের বাক্য শুনে যত বন্ধুগণ।
পূরাতে বন্ধুর আশা করিল মনন ॥
ভাবিতে ভাবিতে সবে যায় নিজালয়।
বিজয় চলিল ঘরে প্রফুল্ল-হৃদয় ॥
নিদ্রায় আবৃত হয়ে নিশি পোহাইল।
ঊষায় উঠিয়া পথে ভ্রমিতে চলিল ॥
যাইতে যাইতে রায় গজেন্দ্র-গমনে।
সুরম্য উদ্যান এক দেখিল নয়নে ॥
কুসুম কানন সেই অতি মনোহর।
প্রবেশিল তাহে রায়, সরস-অন্তর ॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল, অপরূপ শোভা।
গোলাপ মল্লিকা জাতি বেল মনোলোভা ॥
মহানন্দে মধুকর করিতেছে গান।
শুনিলে অন্তরে বেঁধে অতনুর বাণ ॥
বিজয় বিমনা হয়ে করিছে ভ্রমণ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিতেছে তরুণ-তপন ॥
এমন সময় তথা মরাল-গমনে।
আইল কুমারী এক কুসুম চয়নে ॥
যৌবনে আগতা প্রায়, বিনা পতি অলি।
ফুটিবার আগে যেন কমলের কলি ॥
কামিনী কন্যার নাম, ধর্ম্মপরায়ণা।
দিবানিশি একমনে ঈশ্বর-কামনা ॥
বিজয়-লোচন-পথে পড়িল কামিনী।
বিমোহিত হয় রায় হেরে সীমন্তিনী ॥
কষিত কাঞ্চন, আহা, কি আসে ওখানে।
তরুণ অরুণ দেখি আছে নিজ স্থানে ॥

কুসুম-ঈশ্বরী বুঝি কুসুম-কাননে ।
ধীরে ধীরে আগমন ফুল দরশনে ॥
কামিনী আকারে কিম্বা পুণ্য অধিষ্ঠান ।
কামের কামিনী নহে হয় অনুমান ॥
আহা মরি, হেরি মুখ পঙ্কজ-সুন্দর ।
সুশীলতা মাখা যেন তাহার উপর ॥
ললিত লোচন টান লেগেছে নয়নে ।
প্রভায় প্রকাশ করে যাহা আছে মনে ॥
এই পথে আসিতেছে চপলা চপল ।
বচন শুনিয়া করি শ্রবণ সফল ॥
উত্তরিল বিধুমুখী ক্রমেতে নিকটে ।
পুরুষ হেরিয়া পড়ে বিষম সঙ্কটে ॥
ভীতা হেরে কামিনীরে কহে যুবরায় ।
অভয়ে তোল হে ফুল, ভয় কি আমায় ॥
প্রতিবাসী হেরে কথা কহিল কামিনী ।
চমকিত কেন তুমি হেরিয়া কামিনী ॥
কে তুমি, কি নাম ধর, কেন এ কাননে ।
তব রূপ বলিতে না পারি একাননে ॥
কি কারণ, কোথা আসা, আশা তব কায় ।
ধর্ম্মশীল জানিয়াছি হেরে তব কায় ॥
আপনার যদি হয় কুসুম অভাব ।
বলিলে ঘুচাতে পারি অভাবের ভাব ॥
পরিচয় দিয়ে রায় নিল পরিচয় ।
মনোগত কথা পরে বিবরিয়া কয় ॥

বিজয়ের উক্তি এবং কামিনীর উত্তর

বি। ফুলে প্রয়োজন মম নাহি হে কামিনি।
ইচ্ছা নাহি করে আর লইতে নলিনী ॥
হাতে নিতে নিতে যায় হইয়ে মলিন।
ক্ষণেক বিলম্বে হয় সব শোভাহীন ॥
এমন কুসুমে আর নাহি প্রয়োজন।
চিরস্থায়ী সুকুসুমে আছে মাত্র মন ॥

কা। ক্ষণিক অবনীধামে সকলি নশ্বর।
ভাবিয়া কিছুই আমি না দেখি অমর ॥
আশার সুসার তব করিবে কেমনে।
সৃষ্টিছাড়া আশা তব রাখ মনে মনে ॥

বি। কামিনি, বাঞ্ছিত ফুল আছে হে তোমার।

কা। দেখাও তোমায় দিব করি অঙ্গীকার ॥

বি। মনে মনে দেখ দেখি ভাবিয়ে কামিনি।
কামিনী কুসুম কি হে, কুসুম কামিনী ॥

কা। বিজয়, বচন তব বুঝিবারে নারি।
স্থায়িনী বলিয়ে তুমি কিসে ভাব নারী ॥
এখনি মলিনা বলে ত্যজিলে নলিনী।
কি বলে আবার চাহ নলিনী কামিনী ॥
সরোবরে সরোজিনী দেখহ যেমন।
চরাচরে চন্দ্রাননী জানিবে তেমন ॥
কলিরূপে কমলিনী বালিকা কামিনী।
রমণীয় শোভা চক্ষে আনন্দ-দায়িনী ॥
ঢল ঢল মকরন্দে বিকচ কমল।
সরস তরুণী সহ যৌবন বিমল ॥

পদ্মিনীতে মধুকর প্রণয়ে জুড়ায়।
পরিণেতা পরিণয়ে লয় ললনায়॥
অলি চোলে যায় পদ্ম হোলে মধুহীন।
আদরিণী আঁদরিণী যুবতী য'দিন॥
মলিনী নলিনী দুখে পড়ে পদ্মাকরে।
ধরায় মিশায়ে যায় কামিনী কাতরে॥
অবলা ললনা পেয়ে ছলনা কোর না।
অচির ফুলের ন্যায় অচির অঙ্গনা॥

বি। কামিনি, কামিনী-কথা কহিলে কৌশলে।
মনে মনে মনোভাব রাখিয়াছ ছলে॥
কামিনীতে কমলিনী আছে কিছু সার।
তোমায় দেখায়ে আমি করিব প্রচার॥
তুমি পদ্ম পদ্মমুখি, তুমি পদ্মাসন।
জীবন নিধন হবে, না যাবে জীবন॥
মাটিতে গঠিত কায়, কমল সমান।
শমনের আগমনে হইবে নির্ব্বাণ॥
কিন্তু দেখ মনোমাঝে ভাবিয়ে কামিনি।
ভুবন-মোহিনী মন ভুবন-মোহিনী॥
কোন কালে তার রূপ নাহি হয় লয়।
চির কাল সমভাবে রয় দেবালয়॥

কা। মনের যে কথা তুমি বলিলে এখন।
শাস্ত্রজ্ঞানে জানিয়াছি এই বিবরণ॥
নিরাকার মন হয় লাবণ্যবিহীন।
কি দেখে হতেছ তার প্রেমের অধীন॥

বি। আহা মরি আদরিণি, শুনহে স্বরূপ।
মন মনোমোহিনীর অপরূপ রূপ॥

তোমার লাবণ্য হেরে জুড়ায় নয়ন।
তব মনরূপ দেখে বিমোহিত মন ॥
সতীত্ব সুশোভা তার বয়ান বিমল।
পরসুখ অভিলাষ লোচন কমল ॥
ভাল ভাল শোভা করে পরেশ প্রণাম।
ভাবনা চিকণ চুল শ্যাম যেন জাম ॥
উপদেশ অনুরক্তি শোভিছে শ্রবণ।
সাধুর সুখ্যাতি তায় কুণ্ডল ভূষণ ॥
পাপ ছাড়ি পুণ্য লব সদা এই আশা।
অতি সূক্ষ্ম অপরূপ শোভা করে নাসা ॥
সদা সুখ আলাপন রসনা সুন্দর।
সুশীলতা সরলতা শোভে ওষ্ঠাধর ॥
মনোহর পয়োধর পরম প্রণয়।
ক্রমশঃ উন্নত কভু নত নাহি হয় ॥
ক্ষমাপর উপকার শোভে দুই পাণি।
পরম সুন্দর শোভা তুলনা না'জানি ॥
কামকায় সম পাপ শোভে মাজা ক্ষীণ।
পুণ্যের সঞ্চয় তায় নিতম্ব নবীন ॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বিশ্বাস।
অপূর্ব্ব যুগল পদ নাহি কভু নাশ ॥
তব অঙ্গ-আভা নব-বিভাকর-বিভা।
মন-অঙ্গ-আভা নিত্য নিরমল-নিভা ॥
এমন এ মন হেরে বিমনা যে মন।
জানে জানে জানে আর মনে মনে মন ॥
যদি এ বচন সত্য হয় অনুমান।
মনোরমা মন-রামা, রামা কর দান ॥

কা। ও মা কত বেলা হোলো কথায় কথায়।
দেখিতে দেখিতে ভানু আইল কোথায়॥
যাই যাই, করি গিয়ে কুসুম চয়ন।
এসো তুমি সঙ্গে এসো কর হে ভ্রমণ॥
বি। তোমার বেড়েছে বেলা আমার লাগিয়ে।
চল চল দিব ফুল তোমায় তুলিয়ে॥
কা। বাধিতা তোমার কাছে, শুনে সারবাণী।
এই উপকারে দাসী হইবে কামিনী॥

মনানন্দ মনে মনে রাখিয়ে গোপনে।
উভয়ে নিযুক্ত হয় কুসুমচয়নে॥
কনক কুসুম-পাত্র কামিনীর করে।
বিজয় কুসুম রাখে তাহার ভিতরে॥
চতুরের চূড়ামণি, রসিকের সার।
ফুলে ফুলে মনআশা করিল প্রচার॥
প্রফুল্ল কামিনী এক লোয়ে রস রঙ্গে।
ফুলাধারে দিতে মারে কামিনীর অঙ্গে॥
কামিনী কামিনী-ঘায়ে ফিরায়ে নয়ন।
সুখেতে মধুর রবে বলিল তখন॥
কা। শ্রমে ভ্রমে কোন্ ক্রমে ওহে যুবরায়।
ফুলাধারে দিতে ফুল মারিলে হে গায়॥
বি। আ মরি সুন্দরি ধনি, রেগ না অন্তরে।
না জেনে দিয়েছি ফুল ফুলের উপরে॥
ভুলের ফুলের ঘায় যদি পাও দুখ।
আমারে মারিয়ে ফুল, ঘুচাও অসুখ॥

কা। মারিতে বাসনা বটে ফুল পেলে গায়।
কিন্তু সখা দুঃখ দূর নাহি হবে তায়॥
মন খুলে ফুল যদি মারিতে এ জনে।
পরিশোধে পরিতোষ পাইতাম মনে॥
বি। জানিয়ে কুসুম যদি মারিলে তোমায়।
সুখী হও ফিরে ফুল মারিয়া আমায়॥
তব সুখ সম্পাদনে করি প্রাণপণ।
এই ফুল মারিলাম, জানিয়ে এখন॥
কা। কুসুম-আঘাত নাথ, খেতে সাধ ছিল।
সে আঘাত পেয়ে মন মোহিত হইল॥
বিদ্যার সাগর তুমি, নাহি পাপলেশ।
নিরমল মন তব, পবিত্র বিশেষ॥
কে করিবে বোলে শেষ সুগুণ অশেষ।
অবশেষে ভাবে শেষ কি করিবে শেষ॥
পরমেশ দাস দাসী নর নারী হবে।
পরিণয় প্রিয়বর, শ্রেয়স্কর তবে॥
দম্পতি-মিলন যদি শুভ ক্ষণে হয়।
পুণ্য সহ চারি গুণে সুখের সঞ্চয়॥
প্রমদার সহযোগে পতির দ্বিগুণ।
কামিনীর দুই গুণ পেয়ে পতিগুণ॥
বিবাহে বাসনা মম আছে অবিরত।
ভাগ্যদোষে নাহি পাই মন মনোমত॥
অবোধ অবলা-চয় বিগুণের বাসা।
ধনশালী রূপবান্ পতি করে আশা॥
বিষয় বিভব মাত্র লাবণ্য অসার।
ভয়ানক হয় তায় ভব পারাবার॥

জীবন জীবন তার বাসনা বাসনা।
পতি-মনোজ্যোতিঃ যেই না করে বাসনা॥
বি। কি কব মনের কথা কামিনি, এখন।
বিবাহেতে আগে নাহি ছিল মম মন॥
পুরুষেরা কাপুরুষ পরিণয়ে হয়।
কামিনী কামের দাসী মনে মনে লয়॥
জগতে প্রধান শোভা কামিনী নির্ম্মাণ।
পুণ্য অনুষ্ঠান হেতু পুরুষে প্রদান॥
কি হেতু এ দান তাঁর নাহি আলোচনা।
আনন্দে বোধান্ধ হয় হেরে সুলোচনা॥
রূপসী রমণী হলে মনে ধন্য মানে।
ষড় ঋতু দেখে কেহ কামিনী-বয়ানে॥
প্রণয় শত্রুতা তার বিচ্ছেদ মিলন।
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম যে করে হেলন॥
উভয়েই মন চুরি করিয়া বচনে।
মনানন্দে পুলকিত হয় দুই জনে॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিয়ে করিয়ে সাধন।
নিজ বাসে যেতে দোঁহে করিল মনন॥
পরিবর্ত্ত করি পরে বিদায়ি চুম্বন।
নিজ নিজ ধামে চলে, বিরস-বদন॥
বয়স্যে বলিল সব রাজবিদ্যমান।
প্রকাশিত পরিণয় হয় সমাধান॥
সুপ্রকাশে পোহাইল দুখের যামিনী।
সুখের দম্পতি হোলো বিজয় কামিনী॥

জামাই-ষষ্ঠী

(প্রথম বারের)

জ্যোষ্ঠী মাসে ষষ্ঠীবুড়ী যষ্টি করি করে।
জামাই জামাই বলি ফেরে ঘরে ঘরে ॥
পর রে পোশাক সব হও রে ত্বরিত।
চল রে শ্বশুরবাড়ী আমার সহিত ॥
নব-বিবাহিত যত ছিল যুবাচয়।
দেবীকে আগতা দেখি প্রফুল্ল-হৃদয় ॥
যাইতে রমণীপাশে বিলম্ব সহে না।
বারণ সমান মন বারণ মানে না ॥
কামিনী কনককায় করিতে দর্শন।
উন্মীলিত আছে সদা মনের নয়ন ॥
প্রমদার প্রেমডোরে টানে মনোরথ।
এক দণ্ডে হয় বোধ ছ'মাসের পথ ॥
পরিল ঢাকাই ধুতি উড়ানি উড়িল।
কামিজ পিরান পেংগি কত গায় দিল ॥
কারপেট সুজ পায়, আঙ্গুলে অঙ্গুরী।
কাটিয়া বিলাতী সিঁতি বাড়ায় মাধুরী ॥
ঘড়ির শিকল গলে, ট্যাঁকে থাকে ঘড়ি।
কোমরে সোণার বিছা, হাতে হেম ছড়ি ॥
প্রেম-রবি সকলের সমান উদয়।
সকলেরি সমানন্দ ষষ্ঠীর সময় ॥
ধনহীন দীন দুঃখী তারা সজ্জা করে।
যেতে হবে মধুপুরে, দুঃখেতে কি করে ॥

সুবেশে শ্বশুরবাড়ী বাড়াইতে মান।
বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান॥
কোন জন বলে আসি ইয়ারের সনে।
ধুতি হোলে যেতে পারি শ্বশুর-ভবনে॥
চাদোর অভাব মোর বলে অন্য জন।
রিপু করে নিব ধুতি করিয়ে যতন॥
কেহ বলে কেমনে শ্বশুরালয়ে যাই।
যোটাতে বসন পারি টাকা কোথা পাই॥
পরের পোশাক পরি কোরে ফতো জারি।
ফিরে এসে ফিরাইয়া তাহা দিতে পারি॥
ধার করা টাকা ব্যয় হবে তথা গিয়া।
শ্রীঘরে যাইতে হবে শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
যেমনে হউক সবে উদ্যোগী গমনে।
চঞ্চল হয়েছে মন কামিনী কারণে॥
চরণ বাহন কার, কার হয় করী।
শিবিকায় যায় কেহ, কেহ তরি'পরি॥
মুখের মাধুরী হেরি মোহন মুকুরে।
গদ গদ চালে পদ, জায়া যেই পুরে॥
উপনীত একে একে আনন্দ-ভবনে।
প্রেমানন্দে পুলকিত পুরবাসিগণে॥
প্রেমদা-পিতার পদে প্রণতি করিয়া।
অন্দরে জামাই যায় কৌতুকী হইয়া॥
মুদ্রা দিয়া বন্দিলেন শাশুড়ীচরণ।
উপরে তুলিতে মুখ লজ্জিত নয়ন॥
মেয়ের ভেড়ুয়া করা শাশুড়ীর ক্রিয়া।
আশীর্ব্বাদে গরু করে ধান দূর্ব্বা দিয়া॥

ছলনা ললনাগণ গোপনে করিল।
ভাঁটা'পরে কাষ্ঠাসন বসিবারে দিল॥
আহ্লাদে প্রহ্লাদ ক্ষেপা বসিল তাহায়।
টলিয়া চলিল পিঁড়ি বড় লাজ পায়॥
উঠিল হাসির ঘটা রূপসীমণ্ডলে।
ঘোড়াছাড়া গাড়ী যায় দেখ দেখ বলে॥
শ্বশুর-দুহিতাগণ যেখানে যে ছিল।
এক বিনা একে একে সকলে আইল॥
কৌতুক করিতে সুখে নন্দায়ের সনে।
আইল শালাজগণ গজেন্দ্রগমনে॥
নবীন পুরুষ ঘেরি বসে যত নারী।
বিহার-বিপিনে যেন বিপিন-বিহারী॥
কোন রামা বলে মা গো বোবা কি জামাই।
আর জন বলে দিদি ভাবিতেছি তাই॥
কেহ বলে আই আই বলি লাজ খেয়ে।
আমা পানে রহিয়াছে একদৃষ্টে চেয়ে॥
জামাই কহিল কথা লাজ পরিহরি।
নীরব-কাহিনী মম শুন লো সুন্দরি॥
বিধুকলা বিধুমুখি তব বিধুমুখ।
পূর্ণোদয় দিনে দেখি মূক হল মুখ॥
নীরদ-নিনাদ মম, ভয় পাবে শশী।
নিরীক্ষণ করি তাই মৌনমুখে বসি॥
রামা-আস্য সুপ্রকাশ্য মৃদু হাস্যময়।
অরুণ উদয় যেন উষার সময়॥
খাদ্য দ্রব্য নানামত করে আয়োজন।
বৃথায় বর্ণন তার জানে সর্ব্বজন॥

চাতুরী চতুরা মেয়ে করে পায় পায়।
পায় পড়া যারা তারা লজ্জা নাহি পায়॥
কলাগাছে ডাব করে বাটাভরা পোকা।
চতুরের ভয় কিবা, ঠকে যায় বোকা॥
চীরপোরা ক্ষীরছাঁচ চিনি হয় ঘুণ।
পিটুলির চন্দ্রপুলি গুড়া চূণ লুণ॥
সলজ্জ শ্বশুরবাড়ী খায় লজ্জা মনে।
মাথা খাও, খাও খাও, বলে রামাগণে॥
পেটে খিদে, মুখে লাজ, শুনে হাসি পায়।
হাবা ছেলে হেটমুখে আধপেটা খায়॥
অধুনা প্রস্তুত অন্ন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন॥
জামাই কামাই নাই অন্য কর্ম্ম ছাড়ি।
চোরের উপরে করে ভাল বাটপাড়ি॥
ভাতের ভিতরে এক বাটি দিয়াছিল।
গোপনে গোপাল তাহা চুরি করে নিল॥
চপলা অবলাকুল হয় চিন্তাকুল।
বাটি কোথা গেল বলি বড়ই ব্যাকুল॥
রসিক বলেন শুন রসিকা অঙ্গনা।
অন্ন-জ্ঞানে খাইয়াছি হয়ে অন্যমনা॥
কিম্বা গলে গেছে তব নয়ন আগুনে।
পাথর সলিল বাম লোচনের গুণে॥
ভোজন সাধন হলে ফিরে দেয় বাটি।
পান খেতে খেতে পরে আসে বারবাটী॥
আমোদ প্রমোদে পূর্ণ যত পুরলোক।
প্রকাশে সবার মনে পুলক-আলোক॥

মিলাইতে নারীরত্ন স্বামী স্বর্ণ পরি।
অস্তাচলে চলে হরি ধরা পরিহরি॥
বিনোদিনী সাজাইতে সাজে রামাগণ।
কত মত করে বেশ হয়ে একমন॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার পরায় অশেষ।
বেণী বিনাইয়া শেষ করে দেয় শেষ॥
চন্দ্রমুখ মুছি টিপ কাটিল সরস।
শশধরকোলে যেন শোভা করে শশ॥
কুসুমে ভূষিত করে ভুবন-ভামিনী।
মহেন্দ্রভবনে যেন মহেন্দ্র-মোহিনী॥
দুগ্ধফেননিভা শয্যা বিস্তার করিয়া।
জীবিত সরসীরুহ রাখে বসাইয়া॥
জ্ঞানযুক্ত অলিরাজে আনিতে হেথায়।
সহচরী ত্বরাত্বরি ডাকিবারে ধায়॥
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন যতেক যুবতী।
রত্নময় বাম পাশে রাখে রত্নাবতী॥
শোভা হেরি যায় চলে সুলোচনাগণ।
দম্পতি করেন সুখে শর্ব্বরী যাপন॥
আড়ালে থাকিয়া যত সুরসিকা মেয়ে।
কপাট জানালা দিয়া সবে দেখে চেয়ে॥
কোন ধনী কথা কয় মৃদু মধু স্বরে।
ওলো ধনি, একি ধ্বনি শুনি এই ঘরে॥
কি কর মুরলীধর মোহিনীর কাছে।
নয়ন পূরিয়া দেখ কিবা শোভিয়াছে॥
বিমল কমল কোলে, কি কর বসিয়া।
মকরন্দ কর পান মানস পূরিয়া॥

প্রথমেতে প্রণয়িনী কথা নাহি কয়।
সম্বোধিয়া নব কান্তা কান্ত কোলে লয়॥

লঘু ত্রিপদী

কামিনি যামিনী সুখের কাহিনী
কহিয়া যাপন কর।
বদন মধুরা কেন কামধুরা
ঢাকিতেছ দিয়া কর॥
তব ওষ্ঠাধর জিনি ইন্দীবর
সুধার আধার জানি।
অন্তর চকোর চরিতার্থ মোর
কর, করি যোড়পাণি॥
বিধাতা বিমুখ, তব বিধুমুখ
ঘোম্‌টা-রাহুতে গ্রাসে।
আজ্ঞা কর ছলে দানবেরে বলে
নাশি আমি অনায়াসে॥
স্বামীর বচনে বামা হাসে মনে
ঘাড় নাড়ি করে মানা।
নিষেধ সে নয়, প্রেম পরিচয়,
ভাবুকের মন জানা॥

পয়ার

বাহিরেতে রামাগণ শুনে সুখী হয়।
হইবে মানস পূর্ণ শুন রসময়॥
এক 'না' শুনিয়া নানা দুঃখিত অন্তরে।
আর না, আর না, কত বলিবে হে পরে॥

কান্ত বলে সুধামাখা এখন হবে না।
এ হবে না পরে আর রবে না রবে না॥
পতির রসের কথা শুনে পত্নী হাসে।
ধীরে ধীরে গুণমণি দৈত্যবরে নাশে॥
প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম স্বামী পরশনে।
প্রেমালাপে পরিতুষ্ট হয় দুই জনে॥
নিত্য নিত্য নব সুখ এরূপে ভুঞ্জিয়া।
স্বধামে জামাতা যায় শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
ষষ্ঠীদেবী পূজা করি সবে সুখী হয়।
প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী হৃদয়ে উদয়॥
অভাগা অনূঢ়া যারা, তারা মনোদুখী।
দীনবন্ধু মিত্র কহে, কর ষষ্ঠী সুখী॥

জামাই-ষষ্ঠী*

(দ্বিতীয় বারের)

আইল সুখের ষষ্ঠী, সুখ জষ্ঠি মাসে।
ধাইল জামাই সব, শ্বশুর-আবাসে॥
ফুটিল প্রেমের ফুল, হৃদয়-কাননে।
ছুটিল কামের তীর, কামিনী-আননে॥
নবীন নায়ক সব, ছিল উচাটন।
পাঁজি দেখে বুঝাইয়ে, রেখেছিল মন॥
আশা-তরি ভাসাইয়ে, সময়-সাগরে।
কাটিয়াছে এত দিন, ধৈর্য্য হালি ধরে॥
ছাড়ায়ে শীতল-ষষ্ঠী, ভাবাকুল মন।
কত শোকে অশোকের, পায় দরশন॥

অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গে।
নানা ভাবোদয় মনে, প্রমদা-প্রসঙ্গে॥
কেহ বলে হেলে আর, নাহি পায় পানি।
দেখি নাই মুখপদ্ম; ধরি পদ্মপাণি॥
মাঝের ক'দিন হোক্, এখনি যাপন।
অশোকে অরণ্য-ষষ্ঠী, করি উদ্‌যাপন॥
ফলে সহকারি পরে, সুখের সঞ্চার!
অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার॥
সহসা জামাতা যত, উঠিল শিহরে।
শুভ গমনের তরে, সুখে সজ্জা করে॥
কাল্‌নাগিনী-পেড়ে ধুতি, পরে সমাদরে।
কোঁচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে॥
শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর।
অপরূপ কপ্ আঁটা, চোনাট্ সুন্দর॥
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি।
সে উড়ানি নায়িকার, নয়ন-জুড়ানি॥
গলায় বিলাতি চেন্, পকেটেতে ঘড়ী।
কাঁটা তার, প্রেম কাঁটা, বেঁধে ঘড়ী ঘড়ী॥
কারপেটি জুতা পায়, শোভা পায় যত।
জুতা নয়, সে জুতায়, জুতা মারে কত॥
করশাখা সুশোভিত করিল অঙ্গুরী।
গলায় রুমাল বেঁধে, বাড়ায় মাধুরী॥
কেশে কাটি বাঁকা সিঁতি, বিলিতি ধরণে।
মনেতে গরব কত, পরব-পালনে॥
রমণীয় পরিণয়ে, পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের, হৃদয়ে উদয়॥

কিবা রাজা কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীযূষ-প্রণয়-রসে, সমান বিলীন॥
রম্য হর্ম্ম্যে, গজদন্ত, নির্ম্মিত পালঙ্গে।
যত সুখ, ভুঞ্জে ভূপ, রাণী-রসরঙ্গে॥
তৃণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়সীর সনে।
ততোধিক হয় সুখী, প্রেম-আলিঙ্গনে॥
কৃষিণীর বিম্বাধরে, করিয়া চুম্বন।
পাতার কুটীর ভাবে, ইন্দ্রের ভবন॥
জামাই-শ্রেণীর মাঝে, দীনহীন যত।
সুমধুর মিষ্টি ভাষে, তুষ্টি-লাভ কত॥
পাঠ করে কুল-কোষ্ঠী, গোষ্ঠী অনুসারে।
জষ্ঠি মাসে, ফষ্ঠি করি, ষষ্ঠী-পালা সারে॥
রিপু-করা ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ।
ভাবে মনে আদি রিপু, কিসে হবে তোষ॥
লোকে বলে এই ধুতি, এনেছিল চেয়ে।
ফলে আর, সুখী কেবা, আছে তার চেয়ে॥
ছেঁড়া সূতা যোড়া দিয়া, যোড়াগাঁথা রয়।
ভেড়াভেড়ি হলে আর, ছেঁড়াছিঁড়ি নয়॥
যে জন হয়েছে, ঘর-জামায়ে, জামাই।
কোন দিন নাহি তার, ষষ্ঠীর কামাই॥
দু কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়।
ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে, মাচ দুদ খায়॥
অপমানে অপমান, কিছু নাহি বোধ।
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ॥
সদা সহবাসে দারা, স্বসার সমান।
ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়, পিত্রালয় জ্ঞান॥

সতত থাকিয়ে তথা, সুখী নয় মনে।
মাতালে মদের সুখ, জানিবে কেমনে ॥
ফলে যদি এ বিষয়ে, দোষ তার ধরি।
বিচারেতে দোষী হন, হর আর হরি ॥
দু তিন ছেলের বাপ, যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই ॥
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্ব্ব লোকে কয় ॥
এক দিকে বাপ্ সাজে, আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে সাজিলেন জ্যাটা ॥
পুরাণ-জামাই কারো, ধরিবে না মনে।
নবীন-জামাই-কথা রচিব যতনে ॥
একে একে উপনীত শ্বশুর-সদনে।
জামাই আইল দেখি, সবে সুখী মনে ॥
কেহ আসি সমীরণ করে সঞ্চালন।
বারি-ঝারি আনি কেহ ধোয়ায় চরণ ॥
তৈল মাখাইয়ে কেহ দেয় সমাদরে।
মনোসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে ॥
অন্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার।
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার ॥
খাদ্য দ্রব্য নানা মত করি আয়োজন।
অধীরা হইল তারা জামাই কারণ ॥
মাতা খাস্, যা লো দাসি, বাহিরে সত্বরে।
অবিলম্বে বনমালী আনগে অন্দরে ॥
এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে।
মন কিন্তু গেছে মনোমোহিনী-মণ্ডলে ॥

দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃদুস্বরে।
এসো গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে॥
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন্ কাজ।
ব্যস্ত কেন যাই বলে উঠে যুবরাজ॥
ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন।
মুদ্রা দিয়া প্রণমিল শ্বাশুড়ী-চরণ॥
শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ধানেতে প্রকাশ।
তনয়ার হও দাস—এই অভিলাষ॥
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায়।
হাস্ত-আস্তে আসনের নিকটে দাঁড়ায়॥
বোস বোস রসময় বলে রামাগণ।
দাঁড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন॥
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়।
কি কারণ দাঁড়ায়েছি শুন পরিচয়॥
নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমরা সকলে।
আসনে অধম আমি বসিব কি বলে॥
বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি।
না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি॥
হাসিয়ে কহিছে এক তরুণী কামিনী।
হৃদয় জুড়াল শুনে সুমধুর বাণী॥
প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক।
জান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক॥
পতির হৃদয়চক্র নারীর আসন।
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন॥
মুহূর্ত্তেক নিরাসনে নাহি কোন নারী।
অনুক্ষণ বোসে আছে উপরি তাহারি॥

প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাও।
সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও॥
সরস উত্তর শুনি মোহিনীর মুখে।
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে॥
ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পড়ি।
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে-খড়ি॥
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী।
আহা মরি! খাও কিছু, শুষ্ক মুখ-শশী॥
হাবা ছেলে বোবা হয় পীড়ির উপরে।
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে॥
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে।
"ওল্ মানো" বোল তবে ফুটিবে বদনে॥
পরিহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে।
হেঁটমুখে খায় হাবা, নাহি দেখে চেয়ে॥
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন।
জিনিষেতে জাল করে করিয়া যতন॥
বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে।
কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ডাব করে॥
বিচুলির জলে করে মিছিরির পানা।
তৃষ্ণায় জামাই খাবে, না করিবে মানা॥
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর।
পিপীলিকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর॥
কোনমতে মেয়েদের না দেখি কসুর।
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর॥
অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে।
আহ্লাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পেটে॥

তেঁতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাঁচ।
প্রভেদ নাহিক তায়, কেবা পায় আঁচ॥
পিপুলপাতের পানে খিলি বানাইল।
এলাচ নবঙ্গ গুয়া ভেল করে দিল॥
চতুরের চারি চক্ষু প্রিয়া-পিতাবাসে।
করি সব অনুভব বুঝে লয় বাসে॥
জলপাত্র ঢাকা দেখি করিছে কৌশল।
কোথা আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল॥
বলে বাণী কোকিলবাদিনী সুলোচনা।
সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না॥
সুরসিক বলে শুন শুন গুণবতি।
দেববাণী-তুল্য মানি তোমার ভারতী॥
কিন্তু কমলিনি কি হে শোন নি শ্রবণে।
বাঁশ-বনে ডোম কাণা বলে সর্ব্ব জনে॥
আর বামা বলিতেছে বচন সরল।
মোচন কর হে পাত্র, পাইবে কমল॥
গুণমণি বলে "ধনি, শুন বলি সার।
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর॥"
শুনিয়ে সরস ভাষ ভুবনমোহিনী।
বারি-পোরা পাত্র আনি দিলেন তখনি॥
অচতুর অগ্রে করে ঢাকনি মোচন।
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন॥
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে।
গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে॥
বিষম হাসির ঝড়ে উড়িল পরাণ।
অবাক্ আহুরে ছেলে হয়ে অপমান॥

জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপূর্ব্ব অশন॥
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন।
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন॥
মোম গলাইয়া বাটি পূরে ঘৃত করে।
হবি মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে॥
পিটুলির দুদ্ ঢেকে দেয় দুদ-সরে।
সর ফুঁড়ে কার আঁখি যাইবে ভিতরে॥
লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়।
একে বা ঠকিয়ে যায় আরে বা ঠকায়॥
জামাই ঘেরিয়ে বসে সুলোচনাগণে।
পয়ো সহ মধুফল দিতেছে যতনে॥
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে।
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে॥
কেহ বলে উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক।
পার নাকি খেতে তুমি দুদ এক ঢোক॥
অধরে অম্বর দিয়া কহিছে শালাজ।
গোটা কত মিঠে আঁব খাও ত্যজে লাজ॥
নাগর হাসিয়া বলে, আর খেতে নারি।
উপরোধে ভাল চ্যুত দিলে নিতে পারি॥
চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস।
দিতে পারি মনোমত, কিন্তু তাহে আঁশ॥
কি জানি মুকুতা-দাঁতে যদি লেগে যায়।
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায়॥
নাগর কহিছে সব তোমারি ত হাত।
নি-আঁশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁত॥

ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন।
অরসিক তুমি তাই বলিলে এমন॥
যাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ।
নি-আঁশ ও আঁব দেখ মেলিয়ে নয়ন॥
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে।
থতমত খেয়ে কান্ত কিছু নাহি বলে॥
কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে।
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে॥
অবশেষ পান খেয়ে যান যুবরাজ।
আহ্লাদে বসেন গিয়া যুবক-সমাজ॥
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস।
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস॥
মন কিন্তু জামায়ের সদাই অস্থির।
কত ক্ষণে আগমন হবে যামিনীর॥
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ॥
তরুণী তরুণে তাপে তারিতে তরণি।
অবশেষে অস্তে যান ছাড়িয়ে ধরণী॥
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁতার॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া-কমল॥
সুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ।
সাজাইল উমা যেন তুষিতে উমেশ॥
মোহিনীর খোঁপা বাঁধে চিকাইয়া চুল।
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল॥

জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল।
তরুণ অরুণ যেন ঊষায় উঠিল॥

গোধূলিতে ধ্যান পূজা করি সমাপন।
সুখাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ॥
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে।
আছেন পরম সুখে কথোপকথনে॥
রহস্যে রজনী বৃদ্ধি, বলে রামাগণ।
চল চল মনমথ, করিতে শয়ন॥
শ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে সুরত।
আইল শয়নাগারে পূর্ণ-মনোরথ॥
প্রিয়তমা সরোজিনী পালঙ্গ-উপরে।
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে॥
সুবদনীগণে বলে সুমধুর-স্বরে।
সুরঙ্গে অনঙ্গ বস পালঙ্গ-উপরে॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥
শয্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে।
লুকাইয়ে দেখে সব থাকিয়ে অন্তরে॥

কি কথা কহিবে কান্ত করিছে কামনা।
ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইয়ে বিমনা॥
কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই।
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হয়ে গরবিণী।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণি॥

কামিনী কহিল কথা পীযূষের তারে।
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে ॥
সুরসিক তুমি নাথ, আমি হে বালিকে।
বচন-রচনা ভাল রসিকা রসিকে ॥
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক।
কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি সুরসিক ॥
তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন ॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর ॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুজ্‌ঝির ঠাই।
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই ॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল ॥
গুণমণি অধোমুখ সুখ অপমানে।
চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে ॥
নানারূপ আলাপনে নিশি হয় শেষ।
যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ ॥
দিনেক দুদিন থাকি মথুরা-নগরে।
বিদায়ি বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে ॥
মনোসুখে প্রণমিয়া ষষ্ঠীর চরণ।
রচিলেন দীনবন্ধু সুখের পার্ব্বণ ॥

['সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫২]

লয়াল্টি লোটস্

অর্থাৎ

রাজভক্তি শতদল

এস ভ্রাতা আলফ্রেড, আদরের ধন,
আনন্দে নাচিছে আজি আর্য্য-সুতগণ,
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, তব চারু চন্দ্রাননে,
করিবে উল্লাসে সবে রাজ-দরশন।
দয়াময়ী মা জননী রাণী ভিক্টোরিয়া
তোমাতে উদয় অস্ত রাজ্য উজ্জ্বলিয়া।

বস হে রাণীর পুত্র, পৃথু-সিংহাসনে,
পৃথ্বীপতি শোভা হেরি পুলকিত মনে।
শত বৎসরের পরে, মা মহিষী দয়া করে,
পাঠালেন প্রিয় পুত্র ভারত-ভবনে;
কে বলে আছেন্ মাতা আমাদের ভুলে,
এই যে স্নেহের চিহ্ন হিন্দুপুত্র কুলে।

উদয় অন্তরে আশা আপনা আপনি,
এইবার আমাদের ভাবি নরমণি
যুবরাজ স্নেহভরে, প্রজার পালন তরে,
আসিবেন সঙ্গে লয়ে পবিত্র রমণী,
উথলিবে সুখসিন্ধু হিন্দু দেশময়;
জয় জয় যুবরাজ জয় জয় জয়।

ভবেশে ভকতি-ভরা মাতা ভিক্টোরিয়া,
বীর-প্রসবিনী রাণী বীর-বরণীয়া,

পরে পুলকিত মনে, সহ নিজ পরিজনে,
উদয় হবেন সুখে ভারতে আসিয়া ;
মা বলে প্রজার দলে করিছে রোদন,
লবেন কোলেতে তুলে চুম্বিয়ে বদন।

বস হে ডিউক ভাই, হিন্দু ভাই-দলে
শ্বেত-শত-দল-মালা দিই তব গলে,
ক্ষীর সর নবনীত, মতিচুর মনোনীত,
মনোহরা চন্দ্রপুলি গঠা সুকৌশলে,
সমাদরে করি দান বদনে তোমার,
তা চেয়ে সুতার দিই প্রেম-উপহার।

বাজাও তবলা বাঁশী বেহালা সেতার,
এমন সুখের দিন কবে হবে আর,
ঘুমুর বান্ধিয়ে পায়, পেসোয়াজ দিয়ে গায়,
নাচ রে নর্ত্তকি, লয়ে ভঙ্গি মেলকায় ;
গাও রে গায়িকা গীত, দিব্য তান লয়ে,
হারায়ে ইন্দ্রের সভা ভারত-আলয়ে।

মেয়ো সনে রাজপুত্র বসেছে সভায়,
আলোময় কলিকাতা অধিপ-আভায় ;
দীপরত্ন অঙ্গে পরি, আভাময়ী এ নগরী,
প্রজার হৃদয়-আভা মিলিয়াছে তায়।
ধর্ম্মশীলা হিন্দুবালা ইন্দুনিভাননী
অলিন্দে দিতেছে দীপ দিয়ে হুলুধ্বনি।

মঙ্গল-সাধন-হেতু বঙ্গ-বরাঙ্গনা
গুণপনা সহকারে দেছে আলপনা,
গন্ধপুষ্প দূর্ব্বাধান, সমাদরে করি দান,
মনসাধে সাধিতেছে ভূপ-উপাসনা।
ধন্য বঙ্গ-বিলাসিনী মঙ্গলনিধান,
কোথা সতী ভক্তিমতী তোমার সমান ?

রাজপুত্র সিংহাসনে, বড় শুভ দিন,
কে বলে ভারতে আর স্বাধীনতা-হীন ?
আপন নয়নে তুমি, দেখিলে ভারতভূমি,
আনন্দ সাগরে সব দেখিলে বিলীন ;
বলিবে বিলাতে গিয়ে শুভ সমাচার,
ভাসিয়াছে ভারতের ভক্তি-পারাবার।

কি দিব মহিষী-পদে সকলি তাঁহার,
লয়াল্টিলোটস্ লও ভারতের সার,
রাজভক্তি রসে গলি, ভিক্টোরিয়া জয় বলি,
করতালি দেহ সবে সুখে একবার ;
পাইলাম এত দিনে জননীর কোল
ভিক্টোরিয়া জয় বলি দেহ হরিবোল।

প্রভাত *

রাত পোহালো, ফর্‌সা হলো,
ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
যুটলো অলিকুল।

পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্‌লো দিবাকর,
সোণার বরণ, তরুণ তপন
দেখ্‌তে মনোহর।
হেরে আলো, চোক জুড়ালো,
কোকিল করে গান,
বৌ-কথা-কয়, কর্‌য়ে বিনয়,
ভাঙ্‌চে বয়ের মান ;
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাক্‌চে কত কাক,
পূজ-বাটীতে, জোর কাটিতে
বাজ্‌চে যেন ঢাক।
পতি বিরহে, পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী,
ঝর্‌য়ে নয়ন, তিত্‌য়ে বসন,
কাট্‌য়েছে যামিনী ;
গেল রজনী, হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,
যাচ্চে উষার বায়।
মাথা তুলি, মরালগুলি,
নদীর কূলে ধায়,
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়।
ঘোম্‌টা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে,
ছোট বোয়ের কুল,

মাজ্‌চে বাসন, বাজ্‌চে কেমন,
তাবিজ্ লঙ্গফুল ;
পরস্পরে, মধু স্বরে,
মনের কথা কয়।
ঘোম্‌টা থেকে, থেকে থেকে,
হাসির ধ্বনি হয়।
অনেক মেয়ে, গাম্‌চা দিয়ে,
ঘস্‌চে কোমল গা,
পশি জলে, মুখে বলে,
নিস্তার গো মা ;
উঠে কূলে, এলো চুলে,
বসে সুলোচনা,
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কচ্চে উপাসনা।
কত কুমারী, সারি সারি,
দুল্‌চে কাণে দুল,
কানন হতে, কচুর পাতে,
আন্‌চে তুলে ফুল।
আস্তে ঝাড়ি তুঁষের হাঁড়ী,
আগুন করে বার্,
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে,
যাচ্চে চাষার সার।
পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে,
কাপড় দিয়ে গায়,
গোরু চরাতে, পাচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায়।

গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে,
দুদে কেঁড়ে ভরে,
গজ-গামিনী গোয়ালিনী,
বসে বাছুর ধরে ;
হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা
মুচ্‌কে মধুর মুখ,
গোপের মনে, দুদের সনে,
উঠ্‌ছে কেঁপে সুখ।
গাছের তলে, বেড়ে অনলে,
বলে ববম্ বম্,
জটা-শিরে সন্ন্যাসীরে
মার্‌চে গাঁজার দম্।
তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায়,
পথে যেতে, কোঁচড় হতে,
খাবার নিয়ে খায় ;
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন,
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে যাদু ধন।

['বঙ্গদর্শন', আষাঢ় ১২৭৯]

['সংবাদ-প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫৩ । ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০]

সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয়।
এবং কবিতা পরিমাণের দোষ*

দীর্ঘ ত্রিপদী

দিবস হইল শেষ, নাহি কোথা রৌদ্র লেশ,
দিবাকর বসিবেন পাটে।
হেন কালে সরোবরে, শোভা হেরে মনোহরে,
মহিলারা জল লয় ঘাটে ॥
বিমল কমল হাসে, আর রাজহংস ভাসে,
পাশে পাশে প্রিয়া হংসী যায়।
ষট্‌পদ মনোসুখে, পদ্মিনীর মধুমুখে,
চুম্বনেতে মকরন্দ খায় ॥
বহে সমীরণ ধীর, কাঁপে কি না কাঁপে নীর,
স্থির শাখা, পাতা নড়ে সব।
শোভে ফুল চারি পাশে, মধু আশে অলি আসে,
স্বরে করে আনন্দ উৎসব ॥
ভাঁজিয়ে মধুর তান, কোকিল করিছে গান,
শুনে প্রাণ বিমোহিত হয়।
শোভে ধার নব ঘাসে, নয়নের দোষ নাশে
কবির আসন সুখময় ॥
সুশোভিত হেরে বারি, অশেষ বরণ ধারী,
কল্পনা দেবীর আগমন।
দেখেন সরসী সুখে, বচন নাহিক মুখে,
ভাবাকুল হোয়ে একমন ॥

হেন কালে সেইখানে, সুমধুর মিষ্ট তানে,
এল এক কবি মহাজন।
মনে মিলাইছে পদ, চলে কি না চলে পদ,
দেবী কাছে দিল দরশন॥
রবহীন কবিবরে, নোলিত ললিত স্বরে,
কহে দেবী কথা মনোহর।
ওরে বাছা জাদুধন, শোন দেখি দিয়া মন,
যাহা বলি তোমার গোচর॥
দিবসেতে কুমুদিনী, অভাগিনী অনাথিনী,
বিরূপা মলিনী মনোদুখে।
নিশিতে তাহার বেশ, সুশোভিত বড় বেশ,
পবন হিল্লোলে দোলে সুখে॥
কুমুদিনী কেন দুখী, কিসেই বা পুন সুখী,
দিনে রেতে কেন ভেদাভেদ।
তুমি কবি বিচক্ষণ, বোলে এই বিবরণ,
কর মম মনোদ্বিধা ভেদ॥

কবির উত্তর

পয়ার

মানবের ভাগ্য এই, কুমুদিনী ফুল।
সত্যের স্বরূপ দিন, আলো অনুকূল॥
পাপ অনুরূপ নিশি, আঁধার আধার।
এ তিনে প্রকাশ করে, জগৎ সংসার॥
সত্য ধরে যত দিন, থাকে নরচয়।
তত দিন কভু নাহি, হয় সুখোদয়॥

নাহি পায় ভাল পদ, নাহি বাড়ে মান।
অধোমুখ দিবসের, কুমুদী সমান ॥
সত্য ছেড়ে যেই জন, পাপে হয় রত।
নয়ন নিমিষে পায়, সুখ শত শত ॥
মিছে কথা দিয়ে করে, ঋণ পরিশোধ।
স্বৈরিণীর সনে পায়, পরম আমোদ ॥
পরযশ হরে যশ, করে আপনার।
অতি নীচ তোষামদে, প্রিয় সবাকার ॥
পাপের অধীনে পারে, লইতে মেদিনী।
সৌভাগ্য প্রফুল্ল যেন, রেতে কুমুদিনী ॥
সত্যেতে মলিন সব, পাপে আমোদিত।
প্রবল পাপেতে সত্য, শেষ পরাজিত ॥
কুমুদীর সুখ দুখ, কিছু নহে আর!
পাপ পুণ্য ফলাফল, দেয় সমাচার ॥

দেবীর উক্তি

মধুমাখা কথা তব, মুখে বরিষণ।
সুললিত ভাষা শুনে, জুড়ালো শ্রবণ ॥
ভাবের সৌন্দর্য্য কিন্তু, নাহি দেখি তায়।
মজিল না মন তাই, তোমার কথায় ॥
কোথায় শুনেছ তুমি, সত্য পরাজয়।
পাপে কি কখন হয়, মনোসুখোদয় ॥
ধরায় পাপেতে হয়, সম্পদ নির্ব্বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

সুমেরু শিখর সত্য, দাঁড়ায়ে ধরায়।
ঝড় হোয়ে পাপ তারে, উড়াইতে চায় ॥

দূরে পড়ে যায় বায়, ঠেকিয়ে পাথরে।
পাপের কি সাধ্য বল, সত্যে জয় করে ॥
যত জোরে লাগে বাত, মহীধর গায়।
অধশিরে তত দূরে, দূর হোয়ে যায় ॥
সত্যের বিক্রমে পাপ, আপনি পলান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

সত্য তেজ অনুরূপ, রবি তেজময়।
মেঘাকারে ঢাকে পাপ, তাহার উদয় ॥
অক্ষয় তপন জ্যোতি, করে দরশন।
কেঁদে বরিষণ করি, করে পলায়ন ॥
জলদে নাহিক আলো, চপলে যা পায়।
সেরূপ পাপের সুখ, না হইতে যায় ॥
ভানু সম সত্য জ্যোতি, সতত সমান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

শুনেছ ত্রেতায় দুষ্ট, রাক্ষস রাবণ।
করিল অনেক পাপ, বধে জনগণ ॥
পাইল সম্পদ বলে, নাহি হয় শেষ।
কর দিত শচীনাথ, রবি শশী শেষ ॥
মহাপাপী হোয়ে পরে, হরিল জানকী।
কত সুখ পেলে পরে, পরেতে জান কি ॥
সবংশে হইল নাশ, খেয়ে রাম-বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

দ্বাপরে চাতুরি করে, রাজা দুর্য্যোধন।
পাশায় হারায়ে পাণ্ডুবংশ দিল বন ॥
লইয়ে সকল দেশ, বসিল আসনে।
সত্য ধোরে পাঁচ ভাই, ভ্রমে বনে বনে ॥
পালন করিয়ে সত্য, এলো পাণ্ডুদল।
মেঘ ভঙ্গে রৌদ্র যেন, হইল প্রবল ॥
পাপের শরণে কুরু, না পাইল ত্রাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

———

কলিতে কি হয় দেখ, মেলিয়ে নয়ন।
কত দেশ বোনাপার্ট, করিল দাহন ॥
খেদাইয়ে দেশ হোতে, নরপতিগণে।
এনেছিল সব রাজ্য, আপন শাসনে ॥
স্ববলে সম্রাট দলে, দিল বহু দুখ।
কোথা রৈলো অবশেষে, পাপার্জিত সুখ ॥
পড়িয়ে ডিউক হাতে, খোয়াইল মান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

———

তাই বলি ওরে বাপু, নব কবিবর।
পাপের ক্ষমতা নাই, সত্যের উপর ॥
হয় নি, হবে না সত্য, কখন মলিন।
আনন্দে প্রফুল্ল মুখ, সম চিরদিন ॥
প্রথমে দেখিতে গেলে, সংসারের কাজ।
বোধ হয় পাপ সত্যে, সদা দেয় লাজ ॥
সুবিচার কর দেখি, সুধীর হইয়ে।
আলোচনা কর দেখি, জ্ঞানে ডাক দিয়ে ॥

অবশ্য দেখিবে তবে, মনের নয়ন।
সত্যের নীচেয় পাপ, সহস্র যোজন॥

কবির উত্তর

কালের গতিক তুমি, জান না কামিনী।
তাই মন্দ বল মোর, কবিতা নলিনী॥
স্বভাব অভাবে বল, কি ক্ষেতি আমার।
ভাষা দেখে ভাল মন্দ, কবিতা বিচার॥
শত শত ধরে গুণ, পদ্য সুলোচনা।
স্বর মাত্র সকলেই করে বিবেচনা॥
পাইয়ে কবিতা এক, আমি এক দিন।
ভাব বুঝিবারে ভাবে, হলেম বিলীন॥
ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে, হইয়ে অজ্ঞান।
স্বপনেতে করিলাম, তার পরিমাণ॥
রচনা সরস বটে, ভাব বটে খাঁটি।
কঠিন ভাষার জন্যে করিয়াছি মাটি॥

দেবীর উক্তি

কালের এমন ভাব, কে বলে তোমায়।
ভুলেছ এখন তুমি, কাহার কথায়॥
পাগলেতে যাহা বলে, বিজ্ঞে যদি ধরে।
চলিত না কাজ তবে, সংসার ভিতরে॥
সুকবি পণ্ডিত যারা, তারা জানে বেশ।
কবিতার সার মর্ম্ম, ধর্ম্ম উপদেশ॥
ধর্ম্ম নীতি ঢাকা দিয়ে, মিথ্যার বসনে।
সহজে পাঠায়ে দেয়, মানবের মনে॥

মিথ্যা দূর হয় সাঙ্গ, যে হয় পঠন।
অনায়াসে বসে সত্য, হৃদয়ে তখন॥
মিষ্টি ভাষা থাকে যদি, চরণে চরণে।
সুরস লাগে না শেষ, কারো আস্বাদনে॥
বিষয় বুঝিয়ে হবে, ভাষার চলন।
স্বরে অর্থে রাখা চাই, সুতত মিলন॥
কাঠিন্য থাকিবে ভাষে, শাস্ত্রীয় কথনে।
কোমল সরল ভাষা, কামিনী বচনে॥
ঝড়েতে কর্কশ বাক্য, হুহু করে ঘনে।
ধীরি ধীরি ওঠে পদ, মলয় পবনে॥
সংগ্রাম বর্ণনে কথা, করে খন্ খন্।
ষষ্ঠী বাঁটা হাসি হাসি, বচনে রচন॥
উচ্চ মন উচ্চ ভাবে, সদা সুখী হয়।
কাল কিন্তু ভাবে কালা, স্বর লয়ে রয়॥
নর বিনা অন্যে ভাব, বুঝাতে না পারি।
নর সনে স্বরে কিন্তু, পশু অধিকারী॥
স্বপনের বিবরণ, বুঝিয়াছি সার।
দিও না দ্বেষের ফুট, নয়নেতে আর॥
নিজ আভা নিজগুণে, না হোলে প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে, কি হইবে বল॥
ভাষা আগে এই বার, ভাবে দেও মন।
দেখ না দেখ না আর, শুয়ে কুস্বপন॥
উচ্চভাষা ভয়ে বুঝি, হয়েছিলে কাট।
দেয়ালা করেছ তাই, যাট্ যাট্ যাট্॥

উপদেশ দিয়া দেবী, বাতাসে মিশায়।
মাথা নেড়ে কবিবর, নিজবাসে যায়॥
কোথা যাও কবি ভাই, ভাবিতে ভাবিতে।
আমরা পেরেছি কিন্তু, তোমায় চিনিতে॥
ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতি তালের গাছ, ভাব দেখে থাম॥
আঁখি মুদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও, বিভাকর পানে॥

এই পর্য্যন্ত

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
হিন্দুকালেজের ছাত্র।

(সংবাদ প্রভাকর, ৯ আগষ্ট ১৮৫৩। ২৬ শ্রাবণ ১২৬০)

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ

চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই

নির্ম্মলবর্ণা সরলতা দেবীর পবিত্র ক্রোড়ে শয়নপরায়ণ হইয়া তদীয় প্রাণাধিক প্রাণপুত্র সরল কবি স্তন পানে সুমধুর নম্রতারূপ পয়ঃ পান করিয়া মাতৃগুণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নরনিচয়ের সুখ্যাতি শশাঙ্ক সম্যক্ নিষ্কলঙ্ক হয় না। একদা সরলতা সুকুমারকে গৃহে রাখিয়া দিবসত্রয় জন্য তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলে তাঁহার সপত্নী হিংসা দেবী অবসরক্রমে সেই স্থানে আগমন করিয়া সরল শিশুর সরল রসনায় গরল দান করিলেন, যেহেতু এরূপে উভয় পরের অনিষ্ট এবং বালকের অমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা।

হিংসা ঘরে আসিয়াই সতীন-সুতে কোলে লইতে হস্ত প্রসার করেন। কিন্তু জন্মাবধি সরলতার বিমল বদন বিগলিত বিহিত বচন শ্রবণে একবার সুসংস্কার জন্মিলে সহসা কখন কেহ তৎসতা হিংসাদেবীর সুস্বাদু বিষাক্ত বচনে মোহিত হয় না। সুতরাং সরল কবি প্রথমত হিংসার ক্রোড়ে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিতে পারেন নাই। ভোজ-বিদ্যাবিশারদা হিংসাদেবী এমন মধুর মধুর স্নেহবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ধন, মান এবং সুখসম্পাদনের এমন সহজ সহজ উপায় দেখাইতে লাগিলেন, মনোবেদনার এমন আশু প্রতীকার করিতে লাগিলেন, যে সরল কবি কুহক কুআশা ঘোরে অন্ধ হইয়া দৌড়াদৌড়ি হিংসার কজ্জল কোলে উঠিলেন এবং গলা ধরিয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হিংসাও প্রগাঢ় স্নেহের সহিত নূতন ছেলের মুখ চুম্বন করত মনোমত মন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্তা হইলেন। তদবধি সতীনপোর প্রতি হিংসার এমন মায়া বসিল, যে, এক ভ্রূক্ষেপ কাল তাহার বদনসুধাকর না দেখিলে তিনি চারি দিক্ শূন্য দেখেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। এ জন্য 'মার চেয়ে ব্যথিত যে তারে বলে ডান'। সরল কোল ছাড়িয়া গরল কোলে আইলে শিশুর নাম সরল কবি পরিবর্ত্তে বুনো কবি হইল। তদনন্তর হিংসার মন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া তৎকোলে শয়ন করিয়া যে এক অপূর্ব্ব মনোহর স্বপ্ন দেখিলেন অজ্ঞানতাবশতঃ সেই স্বপ্নের কথা সর্ব্বসাধারণের প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় অথবা মনের ভিতর যাহা চিন্তাযোগে আপনা আপনি উদয় হয় সে কেবল বাতাসে দুর্গ নির্ম্মাণ। তাহা মনে মনে রাখাই উচিত, কারণ প্রকাশ করিলে লোকে পাগল বলে। হিংসার পালিত পুত্র এ সব না জানিয়াই সুমিষ্ট স্বপ্নবিবরণ সত্য বলিয়া পত্রে প্রকটন

করিয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে সরোবর-তীরে এতৎ-স্বপ্নোপলক্ষে কল্পনা দেবীর সহিত তাহার কথোপকথন উপস্থিত হইবায় বাড়ী আসিতে কিঞ্চিৎ রাত্রি হয়, তাহাতে হিংসা দেবী নবপ্রসূত বৎসহারা গাভীর ন্যায় উন্মত্তা হইয়া নীচের লিখিত মত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হিংসা

রজনী হইল ঘোর, নাড়ী ছেঁড়া ধন মোর,
এখনো এলো না কেন ঘরে।
পোড়া জন্মে কুলনারী, বাহির হইতে নারি,
না পারি ডাকিতে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক দণ্ড চাঁদমুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
নাহি সুখ প্রাণ উঠে মুখে।
কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে বুনো পাই,
আই ঢাই করে অঙ্গ দুখে॥
দুধের গোপাল বাছা, সব ছেলে মধ্যে বাছা,
সতত মায়ের আজ্ঞাকারী।
হয় সদা সঙ্গোপন, অধ্যয়নে দেয় মন,
সদা সৎ আচরণচারী॥
পড়িয়াছে ইতিহাস, বেদব্যাস কীৰ্ত্তিবাস,
পাঁজি পুথি কিছু বাকী নাই।
চারি যুগ সমাচার, শুন গিয়া মুখে তার,
বলে সব বোসে এক ঠাঁই॥
মুখ-অগ্র রামায়ণ, নহে কিছু বিস্মরণ,
বিবরণ মুখে মুখে বলে।
রাম-সীতে লোয়ে শিরে, বোধ হয় বুক চিরে,
রাখিয়াছে দেখাতে সকলে॥

এমন সোণার ছেলে, থাকিতে কি পারি ফেলে;
কখন্ আসিবে বাছা-ধন।
ক্ষীরে স্তন হোলো ভারি, আর যে থাকিতে নারি,
যাছু পান করিবে কখন্॥
পাড়ার বালকগণে, পেলে মোর বাছাধনে,
কাণাকাণি করে হেসে হেসে।
অতি শান্ত বাছা মোর, যুবাদলে যেন চোর,
অঘোর আমার উপদেশে॥
বলিয়াছি বুঝাইয়ে, রবে মুখে গুও দিয়ে,
লুকাইয়ে করিবে আঘাত।
কেহ বুঝি পেয়ে টেঁর, কোরেছে বিষম ফের,
নহিলে কি জন্য এত রাত॥
প্রতিদিন যাহুমণি, অস্তে গেলে দিনমণি,
অমনি আসিত মোর কোলে।
করিয়ে দিয়েছি কাচ্, তবে কেন হেন কাচ্,
কি জানি পড়িল কোন্ গোলে॥
ওই যে আসিছে যাছ—

কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলের আগমন

পয়ার

ও কি ও কি, ও মা ও মা, কান্না কেন ধন।
কে বোলেছে মন্দ কথা, বল বিবরণ॥
তুমি যে আছুরে ছেলে, ঘরের সোহাগ।
তোমা বিনে মম ধনে, কারু নাহি ভাগ॥
বাপের ঠাকুর যাছু রায়, মরি মরি।
কেন কেন কান্না কেন, এস কোলে করি॥

কে বলেছে কটু কথা, মুখে ছাই তার।
বাপ্ ধন বাছা মোর, কেঁদো নাকো আর ॥

বুনো কবি

জননি জিজ্ঞাসা করি, বল বিবরণ।
পরেতে বলিব মম, কাঁদার কারণ ॥
করিলাম কবিতা রচনা, তিন জনে।
অর্পণ করিল রবি, তাহা সাধারণে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ কথা, বলিতেছে তায়।
চুপি চুপি তুমি তবে, বলিলে আমায় ॥
'অপর দুজনে যাহা, কোরেছে রচন।
তুমি বাপু কর তার, বিচার এখন ॥'
তব বোলে মুগ্ধ হোয়ে, করিলাম তাই।
আদেশের অভিপ্রায়, শুনিবারে চাই ॥

হিংসা

আমার বাসনা যাদু, তোমায় করিতে সাধু,
শুধু নয় স্বগুণ গৌরবে।
ছুপে রাখি পর যশ, কাদা করি পর রস,
মাটি দিই পরের সৌরভে ॥
বাড়াইতে তব মান, কবিতার পরিমাণ,
করিবারে কোরেছি আদেশ।
তা হইলে লোক সব, করিবেক অনুভব,
কবিশূন্য হয়েছে এ দেশ ॥
তুমিই কবির সার, কাব্য লেখ একবার,
আর বার কর পরিমাণ।

সাপ হোয়ে কামোড়াও, ওজা হোয়ে পরে যাও,
সহজে কাজেই বাড়ে মান ॥
বঙ্গ দেশে লোক নাই, তুমিই কবির চাঁই,
সকলেই ভাবে কাজে কাজে।
আপনার গুণ যত, ভাল বল মনোমত,
পরগুণ ফেলো ভ্রম মাঝে ॥
যদি কারো ভাল দেখ, তার পক্ষে মন্দ লেখ,
সবার নীচেতে ফেলো তারে।
অপরের সুকিরণ, করিবারে নিবারণ,
এই বিধি আমার বিচারে ॥

বুনো কবি

কেমন কেমন লাগে, এ কথা আমায়।
করি নি সুযুক্তি আমি, তোমার কথায় ॥
তিন পত্র তিন জনে, লিখিনু যতনে।
প্রভাকর পাঠাইল, তাহা সাধারণে ॥
সাধারণ অভিপ্রায়, শুনিতে সকলে।
কাণ বাড়াইয়ে আছে, পাঠকের দলে ॥
কবিতা সবিতা রবি, তিনিও নীরবে।
কোন্ ভাবে কোন্ কবি, সাধারণে লবে ॥
মাঝে পোড়ে আমি কেন, তুলিলাম মাতা।
মাতা হোয়ে মোর মাতা, খেলে ওগো মাতা ॥
বাদী প্রতিবাদী আসি, বিচার আলয়।
বিচারের তরে হুয়ে, উপস্থিত হয় ॥
বিচারপতির কথা, না হইতে শেষ।
বাদী যদি প্রতিবাদী প্রতি করে দ্বেষ ॥

খপ্ করে ওঠে যদি, বিচার আসনে।
দুই হাত তুলে যদি, বলে সাধারণে॥
আমার বিচারে আমি, করি অনুমান।
প্রতিবাদী মিথ্যাবাদী, বাদীর কল্যাণ॥
তখনি সে হয় তথা, হাসির আস্পদ।
সবে ভাবে ভুলক্রমে, হোয়েছে দ্বিপদ॥
আমিও সেরূপ মাতা, কোরেছি অন্যায়।
শিষ্য হোয়ে গুরুনাম, লিখিয়াছি গায়॥
বিশেষ জিজ্ঞাসা করি, জননী তোমায়।
কে আদি দ্বিতীয় কেবা, জানিলে কোথায়॥
আমি বা রোলেম্ কোথা, বিচার সময়ে।
"ঐ আমি কি আমি আমি" গেছে ভুল হয়ে॥

হিংসা

বাপ রে সোণার বাছা, তোমারি বয়স কাঁচা,
বোঝ না রে জননীর বাণী।
কবি বটে তিন জন, তুমি মোর প্রাণ ধন,
তার মধ্যে একজন জানি॥
যতনে তোমারে ধন, করিলাম সঙ্গোপন,
মাপের লেখনী দিনু হাতে।
তুমি তায় হোলে ভারি, কবি পরিমাণকারী,
নাবিলে না ও দুয়ের সাতে॥
উঠিলে ছাড়িয়ে ভূমি, শাখায় কুরঙ্গ তুমি,
বোসে দেখ কবিদের মাঝে।
উপরেতে বোসে থাকি, সকলেরে দিলে ফাঁকি,
মানী হোলে জনের সমাজে॥

কে আদি, দ্বিতীয় কেটা, ভাবিয়ে দেখি নি সেটা;
এই মাত্র করিলাম মনে।
এসো বলি কাণে কাণে, পাছে আর কেহ জানে,
মনে রাখ গোপনে গোপনে ॥

কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন।

বুনো কবি

যা বল তা বল মাতা, কথা ভাল নয়।
তব উপদেশ নিতে, মনে সন্দ হয় ॥
এ আদি, দ্বিতীয় ইটি, বলিলে কি হবে।
পড়িলে কুঁদের মুখে, বাঁক নাহি রবে ॥
একদল ভুক্ত মোরা, হই তিন জন।
আমার বিচার করা, বিচার লঙ্ঘন ॥
ওরূপ কথায় কারো, মন্দ নাহি হয়।
বিশেষ বলেন তাহা, পোপ মহাশয় ॥

"Envy will merit as its shade pursue,
"But, like a shadow, proves the substance true;
"Wit envied, like the sun eclipsed, makes known
"The opposing body's grossness, not its own.

হিংসার সহিত বুনো কবির এইরূপ মনান্তর হওনের সূচনা হইলে পরিহাস নামে জনেক বয়স্য আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে ডাকিয়া লইয়া গেল।

পরিহাস

এসো এসো বুনো বাবু, বেড়াইতে যাই।
এদিনে লিখেছ ভাল, ভ্যালা মোর ভাই ॥
সে সব হাসির কথা, সরস শুনিতে।
জান না রে মুখে পড়ে, মাথায় মুতিতে ॥

"কমলিনী" বিবরণ, বলিলে কেমনে।
রাগ কেন বল দেখি, কি ভেবেছ মনে॥

বুনো কবি

দেখ না দেখ না ত······নাহি সয়।
কমলিনী কাছে ছোঁড়া দিবা নিশি রয়॥
রাগেতে গুমুরে মরি, থাকি মনে মনে।
কি গুণে মজিল পদী ভ্রমরার সনে॥

পরিহাস

ধর্ম্মশীলা কমলিনী, হরিণলোচনা।
রূপবতী অতিসতী, পতিপরায়ণা॥
বিধির কৃপায় পেয়ে, এমন রতন।
দিবা নিশি করে কবি, সুখ আলাপন॥
এ দেখে শিহরে অঙ্গ, দ্বেষেতে তোমার।
বেহাত্ তোমায় কিন্তু, করে দেশাচার॥
মিসর দেশের রীতি, থাকিলে এখানে।
কমলিনী নাহি যেতো, আর কার স্থানে॥

বুনো কবি

পরিহাস, পরিহাস, কেন কর ভাই।
কি বলিতে, কি বলেছি, ভাবিয়ে না পাই॥

পরিহাস

বেশ বেশ ও কথায়, কাজ নাই আর।
কি ভাবে বলদ তুমি, কর ব্যবহার॥
বলদেতে সেই অর্থ, সকলে লয়েছে।
যাতে লোক অধিকারী, বাচুর হয়েছে॥

এ অর্থে বলদ তুমি, যদি লিখে থাক।
বৃথা কেন শাক দিয়ে, আর মাচ ঢাক॥
তব দ্বেষ স্পষ্ট ইথে, হইবে প্রকাশ।
না কিছু তোমার আছে, গোপন আভাষ॥

বুনো কবি

No, no, ভাই, আমি নই, এমন অসার।
ও অর্থে, বলদ, আমি, করিব ব্যাভার॥
যার বলে হয় লোক, গোরু অধিকারী।
আমি কি সে অর্থ কভু, শব্দে দিতে পারি॥
বলদ অর্থেতে হয়, যেই দেয় বল।
জলদে যেমন অর্থ, যেই দেয় জল॥
পাছে লোক ভাবে আমি, বলদ বলেছি।
নোট কোরে সার অর্থ, নীচেতে লিখেছি॥

পরিহাস

ভাল ভাল যেতে দেও, ও সব বচন।
জিজ্ঞাসা তোমায় করি, এক বিবরণ॥
তব লেখা অনুসারে, হোতেছে প্রকাশ।
এসেছিল মিত্র বাবু, শ্বশুরের বাস॥
তোমায় রাগত কিন্তু, দেখিয়ে জামাই।
জষ্টি ষষ্টি বিরচনে, কোরেছে কামাই॥
এবার কিরূপ হোলো, জানিতে না পাই।
পত্রেতে আভাস দিয়ে, ভাল কর নাই॥
কেমনে আইল, মিত্র বন্ধু, কয় জনা।
কেমনে লইল দ্বারী, করিয়ে বন্দনা॥

কি বোলে, নে গেল, দাসী, বাড়ীর ভিতরে।
কি বলিল শালি মুখ, ঢাকিয়া অম্বরে ॥
শালাজ কেমন দিল, হৃদ্ মিঠে আঁব।
কি কথা বলিল মিত্র, দেখে তার ভাব ॥
কিরূপ কৌতুক হোলো, শয়ন আগারে।
কি কথা কহিল কান্তা, সেতারের তারে ॥
তোমার কারণ ভাই, তোমার লিখনে।
বঞ্চিত হয়েছি মোরা, সব বিবরণে ॥
লিখিয়াছ জান তুমি "বেশের বিষয়"।
এ সব বলাও তব, উপযুক্ত হয় ॥
স্বচোকে সকলি তুমি, দেখিয়াছ ভাই।
আদি অন্ত তব কাছে, শুনিবারে চাই ॥

বুনো কবি

যাও যাও জ্বালাতন, কোর না আমায়।
মন্দ কথা ছেড়ে দাও, পড়ি তুব পায় ॥

———

হাসিতে হাসিতে উড়ে, গেল পরিহাস।
ফিরে যায় কবিবর, আপন আবাস ॥

এখানে চট্টো, মিত্র সমভিব্যাহারে সরলতা দেবী ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রিয়তম জীবনাধিক সরল কবিকে না দেখিতে পাইয়া নগর পর্য্যটনে গমন করিয়াছে বিবেচনায় উপস্থিত কবিদ্বয় সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন।

সরলতা

তার পরে কি হইল, বল বল বল।
শুনিয়ে এ সব কথা, হৃদয় চঞ্চল ॥

তিন দিন হয় নাই, করেছি গমন।
এর মধ্যে এত কাণ্ড হোয়েছে ঘটন॥

চট্টো কবি

তিন দিন বহু কাল, পেলে তিন পল।
করিতে পারেন দ্বেষ, সাগরে অনল॥
পথেতে শুন্নেছ মাতা, সব বিবরণ।
এখন উপায় বল, যাহাতে মিলন॥

মিত্র কবি

উপায় ভাবনা ভাই, ভাবিতে হবে না।
মায়ের স্মরণে দ্বেষ, রবে না রবে না॥
এ ভবনে তিন জনে, হোলে দুরশন।
নয়ন নিমিষে হবে, সরল মিলন॥

সরলতা

অধীর তোমরা বাছা, হও নি নিপুণ।
ব্যস্ত হোয়ে কর গ্রাস, হিংসার আগুন॥
মমালয় থাক সবে, পরম সন্তোষে।
পতিত হবে না কেহ, কভু কোন দোষে॥
সতত থাকিব আমি, ব্যাপিয়া ভবন।
ছেড়ে আর এসো এসো, এসো বাছাধন॥

সরল কবির আগমন*

বল দেখি বিবরণ, বিস্তার করিয়ে।
ভেয়ে ভেয়ে দ্বেষাদ্বেষ, কিসের লাগিয়ে॥

---

* হিংসাও গিয়াছে, বুনো কবি নামও গিয়াছে।

সরল কবি

আলয়ে কখন মার, হোলো আগমন।
তোমা ছুয়ে যোড় করে, করি সম্ভাষণ॥
কি বলিব জননি গো, বাক্য নাহি সরে।
বিবাদে পেয়েছি ব্যথা, সরল অন্তরে॥
কিন্তু মা গো পথ দিয়ে, আসিতে ভবনে।
তব পুণ্য অনুরূপ, পোড়ে গেল মনে॥
অমনি দাহন হোলো, কলহ কণ্টক।
সহসা ফুটিল মনে, মিলন চম্পক॥
খাইল কাঁটার ছাই, ভ্রমের অর্ণব।
বলিতে সে সব মাতা, হলেম নীরব॥
প্রিয়বন্ধু কবি ভ্রাতা, দেখি দুই জন।
তোমার প্রসাদে মাতা, হইল মিলন॥

চট্ট কবি

মোহিত হইল মন, সরল মিলনে।

মিত্র কবি

এই স্থানে অদ্যাবধি, রব তিন জনে॥

সরলতা

এমন মিলন বাছা, হবে কাজে কাজে।
স্বভাব অভাব নহে, তোমাদের মাঝে॥
বিশ্বপাতা বিশ্বপিতা, ভেবে দেখ মনে।
সে কারণ ভাই ভাই, তোরা তিন জনে॥
তিন বিদ্যালয় হয়, এক সভাধীন।
হইয়াছ ভাই ভাই, তাহাতেও তিন॥

বিরচন করি তিনে, দেহ এক ঠাঁই।
এতেও তোমরা তিনে, হও ভাই ভাই ॥
কবিতায় উপদেশ, লহ রবি কাছে।
ভাই ভাই বাঁধাবাঁধি, ইথে আরো আছে ॥
করো না করো না তাই আর দ্বেষাদ্বেষ।
তিন মিলে কর চেষ্টা, তুষিতে স্বদেশ ॥

বিবাদ বাড়বানলে, ঢালিয়ে সলিল।
সরলে সরলে হলো, সুখের সুমিল ॥
সম্ভাষণ আলাপন, করে তিন জন।
সুখের সাগরে ভাসে, সরলের মন ॥
অমিয় বচনে মাতা, তুষিল সকলে।
শিশির পড়িল যেন, নব চারাদলে ॥
অবশেষে লোয়ে তিনে, সরল সুধীর।
তপনে অর্পণ করি, হইলেন স্থির ॥

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র
হিন্দুকালেজ।

(সংবাদ প্রভাকর, ১৭ নভেম্বর ১৮৫৩)

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ

হাতে হাতে পাপের ফল

এ দেশের দেশাচার করিলে বিচার।
পরিতাপ তাপে হয় হৃদয়ে বিকার ॥
বিধিবৈধ বিধি যাহা হয় অনুমান।
তাহার আচার দোষে না হয় বিধান ॥

শিশুকালে পরিণয় হোলে সম্পাদন।
কত রূপ ঘটে মন্দ, কে করে গণন ॥
আরো তায় বিদ্যাহীন যদি হয় নারী।
অনিষ্ট উদয় কত বলিতে না পারি ॥
পবিত্র বলিয়ে সবে, ভাবে লোকাচার।
অভয়ে অবজ্ঞা করে, মনের বিচার ॥
পিতা পিতামহ যাহা, করে নি কখন।
তাহা করিবারে কারো, নাহি সরে মন ॥
সেকালে সকলে মনে, করিত বিশ্বাস।
অবনী বেড়িয়া রবি, ঘোরে বার মাস ॥
জ্ঞানের প্রভাবে কিন্তু, নির্ণয় এখন।
সূর্য্য বেড়ে করে ধরা, সতত ভ্রমণ ॥
পূর্ব্ব-পুরুষেরা ইহা, মানিত না মনে।
এ সব বিশ্বাস তবে, হতেছে কেমনে ॥
চলিত আচার দোষ, দেখিতেছ সবে।
লোকাচার কারাগারে, বাঁধা কেন তবে ॥
শিশুকালে পরিণয়, কর পরিহার।
বিধবারে দিতে পতি, কর দেশাচার ॥
বিশেষ বিনয় সহ, এই অভিলাষ।
রামা-মন হোতে কর, আঁধার বিনাশ ॥
সকল সুখের ভাগী, রমণী রতন।
তার পরিতোষে সুখী, মানবের মন ॥
বিদ্যারত্ন মহাধন, মনের নয়ন।
জীবনের সার ভাগে, কর বিতরণ ॥
বিদ্যা আভা বিনা রামা, ভাবে বিপরীত।
কুলটা হইতে দোষ, না ভাবে কিঞ্চিৎ ॥

পড়ে দেখ নীচের কাহিনী সাধুজন।
প্রমাণ হইবে তবে, আমার বচন ॥
চঞ্চলা নামেতে এক, রাজার নন্দিনী।
বিদেশী পতির তরে, চির বিরহিণী ॥
কুসুমে বাঁধিয়া নাথ, গিয়েছে প্রবাসে।
চঞ্চলা চঞ্চলা বড়, তার আসা আশে ॥
উথলিল সময়েতে, জাহ্নবী যৌবন।
তটে বোসে আছে বালা, উচাটন মন ॥
নায়ক নাবিক বিনে, তরিবে কেমনে।
ডোবে বুঝি অবলার, জীবন জীবনে ॥
এক দিন সহচরী, সঙ্গে রসবতী।
কহিতেছে হাসি-মুখে, মধুর ভারতী ॥
দেখেছিলি তোরা কি লো, তাহারে বাজিয়ে।
যার সনে বাবা মোর, দিয়াছেন বিয়ে ॥
নবীন বয়স কি না, দেখিতে কেমন।
বল্ না জানিস যদি, তার বিবরণ ॥
মনে প্রেম ফোটে কি না, দেখিলে তাহারে।
প্রাণ কেড়ে লয় কি না, নয়নের ঠারে ॥
জনেক প্রবীণা সখী, করে নিবেদন।
শোন শোন বিধুমুখি, আমার বচন ॥
বরমাল্য যার গলে, দিয়াছ চঞ্চলা।
দেখিয়া তাহার রূপ, চপলা চঞ্চলা ॥
তব পিতা মনে ভাল, বুঝেছিল তায়।
হাতে হাতে তারে তাই, দিয়াছে তোমায় ॥
মন মিল কথা কিন্তু, কে বলিতে পারে।
যত দিন থাকে হুয়ে, অজ্ঞান আঁধারে ॥

বালক বালিকা করে, মন বিনিময়।
পুতুলের বর কন্যা, অনুমান হয়॥
আর এক সহচরী, হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতেছে মৃদুস্বরে, নিকটে আসিয়া॥
আজ কেন আদরিণি, বিমনা এমন।
পতি নামে কেন আজ, এত উচাটন॥
পাষাণ হৃদয় তার, বিফল জীবন।
ছেড়ে আছে ভুলে, আহা! তোমা হেন ধন॥
চঞ্চলা অধীরা হোয়ে, বলে তার পর।
মম মন নাহি কিন্তু, তাহার উপর॥
মনোমত নারী সেই, লয়েছে আবার।
দেখি দেখি মম মনে, কি হয় বিচার॥

ত্রিপদী

কিছু দিন তার পর, স্মর-শরে জ্বর জ্বর,
থর থর কলেবর কাঁপে।
একে সরস্বতী বাম, তাহাতে উদয় কাম,
পাপোদয় দ্বিগুণ প্রতাপে॥
পঞ্চশর নিবারণ, করিবারে জ্বলে মন,
অবলা চঞ্চলা পাগলিনী।
দূরে গেল ধর্ম্ম ভয়, কুলমান পরাজয়,
রমণী হইল কলঙ্কিনী॥
নিশিযোগে একদিন, চঞ্চলা সুমতিহীন,
বলিতেছে সহচরী কাছে।
তোরে ভাই বার বার, বলিতে না পারি আর,
বাঁচিবার উপায় কি আছে॥

শোন প্রাণ প্রিয়সই, তাহার উপায় কই,
বড় ঘরে বড় ভয় করে।
সঙ্গোপনে কোন জনে, আনিবারে এ ভবনে,
আছি আমি অন্তরে অন্তরে ॥
চঞ্চলা বলিল আর, সহে না যৌবন ভার,
ক্ষণেক ধরিতে লোক নাই।
জান কোটালের বাড়ি, কেমন নবীন দাড়ি,
দেখ দেখি তারে যদি পাই ॥
হেন কালে কোতয়াল, লয়ে ঢাল তরবাল,
আইল সাধিতে নিজকাজ।
মোহিত কোটাল স্বরে, পাইল আকাশ করে,
রাজকন্যা দিল লাজে লাজ ॥
আসিয়ে ধরিল হাত, বলে এস প্রাণনাথ,
পুরাও মনের অভিলাষ।
কোতয়াল শিহরিল, হাত ছাড়াইয়া নিল,
বলে ও মা এ কি সর্ব্বনাশ ॥
বুঝাইয়ে বলে বালা, শান্ত কর কামজ্বালা,
ঠেকিবে না তুমি কোন দায়।
মনোরম্য দেবালয়, হবে তথা সুখোদয়,
চল চল পড়ি তব পায় ॥
কামের করাল বাণ, তাতে এই যাচা দান,
কোটাল করিল মতি স্থির।
গলাগলি দুই জনে, চলিলেন সঙ্গোপনে,
উপনীত যথায় মন্দির ॥
দৃঢ়তর অঙ্গীকার, করে রামা বার বার,
পতির মুখেতে দিল ছাই।

ধন মন বিতরণে, লইলেন সঙ্গোপনে,
মনোমত বাপের জামাই ॥

পয়ার

দেবতামন্দির করি, প্রেমের মন্দির।
আনন্দে চঞ্চলা আছে, কিছু দিন স্থির ॥
সময়ে হইল শেষ, বিদেশ ভ্রমণ।
রাজার জামাই করে, দেশে আগমন ॥
কঠিন হৃদয়ে ছিল, ছাড়িয়ে রমণী।
বিরূপ দেখিতেছিল, শোভিত অবনী ॥
বড় আশে আসে আগে, শ্বশুর আলয়।
নানাভাবে নানাভাব, হৃদয়ে উদয় ॥
ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা, সংক্ষেপ কারণ।
প্রবাসীরে দেখ সবে, প্রমদা সদন ॥
চঞ্চলার মন বাঁধা, কোটালের পায়।
পতির কথায় সে কি, কিছু সুখ পায় ॥
মন রাখা দুই এক, বলিয়ে বচন।
ঢুলে ঢুলে পড়ে বালা ঘুমের কারণ ॥
এত দিন পরে যদি, দিলে দরশন।
ফুরাও না এক দিনে সব বিবরণ ॥
তোমা বিনে বিরহিণী ছিলেন ভবনে।
অভ্যাস নাহিক তাই নিশি ... ॥
ঘুমাও ঘুমাও আজ ... ।
উঠিয়ে ও ঘরে ... ... ॥
কাছাহীন জী ... ... ।
পতি ... ... ॥

জামাই … … … ।
নাক ডা … … … ॥
ভয় ভাবনায় ভরা, চঞ্চলার মন।
কোথায় গিয়াছে ঘুম, ছাড়িয়ে নয়ন॥
ধীরে ধীরে পরিহার, করি নিজ ঘর।
চল চল চলিলেন, কোটাল গোচর॥
এখানে কোটাল বসে, ভাবে মনে মনে।
এসেছে জামাই বুঝি, শ্বশুর ভবনে॥
কিরূপে কেমন করে, হইবে প্রকাশ।
লাভে হোতে এ দাসের হবে সর্ব্বনাশ॥
চঞ্চলার ভাব ভক্তি, বুঝিয়া দেখিব।
অসম সাহসী কাজ করিতে কহিব॥
হেন কালে রাজবালা, প্রবেশিল ঘর।
পিছন ফিরায়ে আছে, কোটাল সত্বর॥
বিরস বদনে বালা, বলিল বচন।
কেন কেন কেন প্রাণ, ফিরালে বদন॥
কোন অপরাধে বল, আমি অপরাধী।
সাদরে প্রণয়ে বল, কে হয়েছে বাদী॥
মনের বিষাদ বল, ধরি ছুটি পায়।
অবিলম্বে প্রতীকার, করিব উপায়॥
মাতা হেট করে তবে, বলে দুরাচার।
এখন গিয়েছে নারী, গৌরব আমার॥
এসেছে তোমার পতি, নবীন রাজন।
ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলা, এ জন এখন॥
পতির সহিত সুখে, কাটায়ে শর্ব্বরী।
শেষ রেতে মিছে কেন, এসেছ সুন্দরী॥

পুরাণ তেঁতুল বিচি, আমি হে এখন।
নব পতি সনে কর, রস আলাপন ॥
যাইবার তরে পরে, উঠিয়ে দাঁড়ায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা, ধরিলেন পায় ॥
সেই সর্ব্বনেশে বটে, আসিয়াছে আজ।
পথে কেন তার মুণ্ডে, না পড়িল বাজ ॥
কাণাকাণি জানাজানি, নিবারণ তরে।
এতক্ষণ শয্যা-কাঁটা, সহি তার ঘরে ॥
......সমান সেটা, বলিব কেমনে।
... ... লয় মম মনে ॥
... ... হাত এগায়ে।
... ... ঘুমায়ে ॥
... ...।
... ... ॥
... ...।
করিয়ে রাখিব তারে, তোমার গোলাম ॥
কোটাল বলিল তবে, শুন হে রূপসি।
মম বাক্যে তুমি যদি, এমত সাহসী ॥
লয়ে মম তরবারি, ধরিয়ে স্বকরে।
পতিমুণ্ড আন গিয়ে, কাটিয়ে সত্বরে ॥
চমকিয়া কাজকন্যা, উঠিল অমনি।
স্বামিশির কি করিয়ে কাটিবে রমণী ॥
ভয় প্রকাশিলে পাছে, কোতয়াল রাগে।
অস্ত্র লয়ে ব্যস্ত হোয়ে, উঠিলেন আগে ॥
অজ্ঞান নিশিতে যোগ, কাল কাম ঘন।
একেবারে দয়া শশী, হোলো আবরণ ॥

ভাবিতে ভাবিতে রামা, ভবনে চলিল।
পতিমুণ্ড কাটি আনি, কোতয়ালে দিল॥
কোটাল বিস্ময় হোয়ে, সভয়ে কম্পিত।
বিবেচনা করিতেছে, চঞ্চলার রীত॥
কি করিব বিধুমুখি, ভাবিয়ে না পাই।
দেশ ত্যাগ করি চল, দেশান্তরে যাই॥
তোমার কলঙ্ক হবে, মম প্রাণ নাশ।
এই রাত্রে চল যাই, ছাড়িয়ে আবাস॥
অগতি যুবতী সায়, কাজে কাজে দিল।
উপপতি হাত ধরে, নিশিতে চলিল॥
যাইতে যাইতে পথে, নদী দরশন।
কেমনে হইবে পার, ভাবিছে তখন॥
কোথায় তরণী বল, কোথায় নাবিক।
এ বেশেতে ডাকাডাকি, বিপদ অধিক॥
কোটাল বলিল ওহে, এ যে বড় দায়।
সন্তরণ বিনা আর, না দেখি উপায়॥
উলঙ্গ হইয়ে বাঁধ, বসনে ভূষণ।
জলে দাঁড়াইয়ে থাক, এক অনুক্ষণ॥
ও পারে এ সব আগে, আসিব রাখিয়ে।
পরেতে সাঁতার দিব, তোমারে লইয়ে॥
অম্বু অম্বরেতে লাজ, করি সম্বরণ।
খুলিয়া দিলেন ধনী, বসন ভূষণ॥
বস্ত্র অলঙ্কার লয়ে, কোটাল নির্দ্দয়।
অপর পারেতে গিয়ে, উপস্থিত হয়॥
ও পারে থাকিয়া পরে, পাপিনীরে বলে।
কেন কেন রামা আর, দাঁড়াইয়ে জলে॥

উপপতি পেয়ে পতি, দিলে বলিদান।
দুরাচারী নাহি নারী, তোমার সমান ॥
মনোমত প্রাণকান্ত, বাছিয়া নবীন।
আমায় আহুতি ধনি, দেবে কোন দিন ॥
আর দেখ রাজবালা, ভাবিয়ে অন্তরে।
অধম কোটাল আমি, জন্ম নীচ ঘরে ॥
দেশেতে মানুষ ধনি, পেলে না লো আর।
বাছিয়া অবিদ্যা তুমি, হইলে আমার ॥
তোমার উদরে মোর, জন্মিলে কুমার।
দেশেতে হইবে নারী, অসুখ অপার ॥
অধমের অবিদ্যার ছেলে, সেই হবে।
ছোট মুখে বড় কথা, অনায়াসে কবে ॥
গায় পড়ে কলহের, করিবে সোপান।
জন্মদোষে না রাখিবে, মানীদের মান ॥
তাই বলি চন্দ্রাননি, শুন হে বচন।
তব সঙ্গে অনুচিত, করা আলাপন ॥
যাও যাও বৃথা কেন, আর বল চাও।
হাতে হাতে পেলে ফল, বাড়ী গিয়ে খাও ॥
এই বলে কোতয়াল, করে পলায়ন।
জীবনে যুবতী ভাবে, বিষাদিত মন ॥
হেন কালে সেই স্থলে, দেখহ কৌতুক।
মাংস মুখে করি এক, আইল জম্বুক ॥
তটেতে বেড়ায় শিবা, জল পানে চায়।
ভাসিতেছে মীন এক, দেখিবারে পায় ॥
কূলে মাংস রেখে জলে, লোভেতে নাবিল।
সভয়ে সজীব মাচ, জলে পলাইল ॥

নকুলে কূলের মাংস, করিল হরণ।
ফিরে আসি শৃগালের, বিরস বদন॥
আদি অন্ত চঞ্চলার, নয়ন গোচর।
উপহাস করি পরে, বলিল সত্বর॥
কি দেখ শৃগাল, মাংস লয়েছে নকুল।
এ কূল ও কূল তব, গিয়েছে, দুকূল॥
শৃগাল উত্তর করে, লোহিত লোচন।
কোন্ মুখে কালামুখি, কহিলি বচন॥

আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
জারস্থার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠতি নগ্নিকা॥

ভয়ে ভীতা হোয়ে কন্যা, না গেল ভুবনে।
নিলেন সুখের ভেক, সুখ বৃন্দাবনে॥

[ইহার অবশিষ্টাংশ পরে হইবে]

(সংবাদ প্রভাকর, ১৮ নবেম্বর ১৮৫৩)

আমারদিগের বুনো কবিটি প্রায় চঞ্চলার মত চপল। আপনার দোষে অন্ধ কি পরের দোষে তাঁহার চারিটি চক্ষু, বিবাদ কখন একজনে সম্ভবে না, এক হস্তে কখন তালি বাজে না, প্রস্তরের সহিত ইস্পাতের সংযোগ ব্যতীত কখন অনল উৎপত্তি হয় না। আমার যত দোষ তিনি তাহা গত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ আছে কি না আমি বলিতে চাহি না, যথার্থ বিচার-কারকদিগের নিকট কিছুই অবিদিত থাকিবেক না।

কবিবর এরূপ কলহ করিতে আমাকে নিরস্ত হইতে লিখিয়াছেন, সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি কি জানেন না যে,

আমি অনেক দিন "বিবাদ বাড়বানলে সরলতা সলিল" সেচন করিয়াছি, তাঁহার তো উপদেশ দেওয়া নয়, উপদেশ ছলে মনের ঝাল মিটান। গালাগালির সহিত উপদেশ প্রদান করা কিরূপ সভ্যতা তাহা আমরা "অসভ্য" কিরূপে বুঝিতে পারিব। একজন সভ্য সুবাণীর পুত্র রস আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছিল "কালা শিউলি রস দিবি" তাহাতে শিউলি উত্তর করিল "আহা! যে মধুর বচন, রস ছেড়ে গুড় দিতে ইচ্ছা করে।"

হে অধিকারী মহাশয়, যদ্যপি বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে আমি কখনই "মা মাসী" তুলিয়া গাল দিই নাই, বরং আপনি এ বিষয়ে দোষী হইয়াছেন, যেহেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে "বিনা আয়াসের ছেলে" বলিয়া আপনার কুচ্ছনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে এসকল অতি সহজ কথা, কেন না, আপনি যাহার গর্ভজাত বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, বোধ করি এই ভ্রমকূপে নিপতিত হইয়াছেন।

আপনার অল্পবয়সে এত আত্মাভিমান কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ তুমি সূর্য্য আমি রাহু, আপনার কি নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, আমি নীচ, আপনি সুবোধ, মহাশয় কি যথার্থ জানিয়াছেন মাদৃশ লোকেরা আপনার যোগ্য নয়। এ সকল জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নে আপনার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া থাকিবে নতুবা সাধারণ পত্রে প্রকাশ করিতেন না। যদ্যপি "নীচের" কথা হাস্য করিয়া না উড়ান তবে মহাকবি কালিদাসের অভিমানশূন্যতার বিষয় শ্রবণ করুন, "তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যেমন বামন উন্নত পুরুষ-প্রাপ্য ফল গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ অক্ষম আমি কবিতা কীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি,

উপহাসাস্পদ হইব” দ্বারি বাবু,* আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়িবেন।

দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥

সুন্দর রসাল পেয়ে কোকিলের কুল।
কখন না হয় তারা গর্ব্বেতে ব্যাকুল॥
ভেকের স্বভাব দেখ ভাবিয়ে অন্তরে।
কাদা জল খেয়ে গর্ব্বে মক মক করে॥

তোমাকে আর শুনাইতে চাহি না কারণ অধিকক্ষণ “নীচের” কথা শুনিলে আপনার গৌরবের হ্রাসতা হইতে পারে।

বুনো কবির কেমন নির্ব্বিরোধী স্বভাব গালাগালি না দিয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারেন না। মিত্র কবিকে সূর্য্য সম্বোধন পুরঃসর কতকগুলিন কটুবচন বলিয়াছেন। যথা

হে সূর্য্য তোমার কামিনী সকলকে বাস দেয়, তুমি মলমূত্র খাও, তুমি কন্যা হরণ কর, ইত্যাদি এ সকল গালাগালির উত্তরে কালেজের সভ্যতানুসারে গালাগালি নয় বরং সূর্য্যের সদ্গুণ, এবং পাছে পাঠকবর্গ বুনো কবিকে এ সকল গুণে বঞ্চিত বিবেচনা করেন, তিনি গালাগালির কিঞ্চিৎ পরেই আপনাকে সূর্য্য বলিয়া স্বগৌরব উচ্চ করিয়াছেন।

বুনো কবি লিখিয়াছেন মিত্র কবি যদ্যপি পুনর্ব্বার তাঁহার বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করে তবে তিনি প্রত্যুত্তর দানে বিরত হইবেন, এবং “নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে” ইহা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন। এতদিন তবে কি মিত্র কবিকে উচ্চ বোধ করিয়া কুচ্ছশর নিক্ষেপ করিতেছিলেন না

* কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—দ্বারকানাথ অধিকারী।—সম্পাদক

ফলভোগের অভিলাষ ছিল। নীচের কথায় সুবুদ্ধিরা রাগ করেন না, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু মিত্র কবির কথায় বুনো কবি একবার ছাড়িয়া দুই বার রাগ করিয়াছেন, তবে কাজে কাজেই, হয় মিত্র কবি উচ্চ, নয় বুনো কবির বুদ্ধি নাই, কিন্তু মিত্র কবি উচ্চ নয়, সুতরাং—হে কবিবর ও কথা কি এখন খাটে, গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কি বাঁচে, নাচিতে আসিয়া ঘোমটা দিলে কি লজ্জাশীলা বল্বে। চারি পাঁচ লম্ফের পর ফলের আশায় নিরাশ হইয়া ফল পরিত্যাগ করিয়া যাওন কালীন, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" বলা অপেক্ষা "Grapes are sour" বলিলে বলিতেও হইত ভাল শুনিতেও হইত ভাল।

কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং বারি সেচনে ভূমিকে কোমল করে, কেহ তাহাতে প্রস্তর এবং অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। সদুপদেশ বীজ স্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে রোপিত হয়, সুতরাং উপদেশরূপ বীজ বপনাগ্রে মিষ্টকথারূপ বারি দ্বারা মনঃক্ষেত্র নরম করা আবশ্যক। বুনো কবিটি মনঃক্ষেত্রের উত্তম চাষা নন, যেহেতু উপদেশ দিবার অগ্রে কটু বচনরূপ অনল প্রদান করিয়া মনকে দগ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ব যায় না, চোরে যদ্যপি চুরি করিতে নিষেধ করে, তবে কি এ নিষেধ প্রামাণ্য করা উচিত হয় না, নীচ লোকে যদ্যপি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালাস্থ অমৃত পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে

Shakespeare আমাকে বলিবেন—"You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you.'

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
হিন্দুকালেজীয় ছাত্র।

বিধবার বিবাহ

(সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।
১১ ফাল্গুন ১২৬২)

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

একদা পল্লীগ্রামবাসিনী চারুহাসিনী কতকগুলিন কামিনী একত্রে বসিয়া হাস্য কৌতুকে সময় সম্বরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক নবীনা পতিহীনা অনুপমা নামা তথায় আসিয়া ম্লানভাবে অবনতমুখী হইয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, তাঁহার এরূপ ভাবভঙ্গি ও অসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তারিণী নাম্নী কোন এক কামিনী মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুপমা! আজি বোন তোমার সুধাংশুসদৃশ সুচারু লাবণ্যের এরূপ কৃশতা ও বিবর্ণতা কি জন্য ঘটিয়াছে ও বিমল বদন হইতে পীযূষমাখা বাক্য সকল কেনই বা বিনির্গত না হইতেছে, ভগিনি! একটিবার বিধুমুখে মধুমাখা বাক্য কহিয়া আমারদিগের কর্ণযুগলকে সুশীতল ও নেত্রদ্বয়কে হাস্য করত চরিতার্থ কর, আমরা কি তোমার বিমনা ও এরূপ ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে সুস্থির হইয়া রহিয়াছি? ও তোমার নীরপূর্ণ নেত্র নিরখিয়া কি আহ্লাদিতা হইয়াছি? কখনই নয়, তোমার দুঃখানলে আমার-দিগের অন্তঃকরণ অহরহই দগ্ধ হইতেছে, ভগিনি! সহাস্যবদনে বাক্য কও, মনাগুন সম্বরণ সলিলে নির্ব্বাণ কর। অনুপমা

সঙ্গিনীর এরূপ সম্ভাষণ শ্রবণানন্তর অন্তরে আরো খেদান্বিতা হইয়া বলিলেন, বোন! পতিহীনা নারীর মলিনতা ও বন-দগ্ধা হরিণীর চাঞ্চল্য হইবার কারণ কেন অন্বেষণ করিতেছ? তাহারদের মনোদুঃখ অপরে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে, ভগিনি! আমি পতিরত্ন হারাইয়া যেরূপ দুঃখিতা আছি, ও আমার অন্তর যে তাহার নীরজ ন্যায় নেত্র-যুগলের পীযূষময় দৃষ্টি অন্তর হওয়ায় কি পর্য্যন্ত বিষাদাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ ও শ্রবণ করিতে কাহার মন মলিন না হয়? আহা! পতিবিচ্ছেদ কি পরিতাপ, যাহা স্মরণ করিলে মরণকেও শতগুণে শ্রেয়স্কর মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণপ্রদ বোধ হয়, আমি কি এরূপ প্রিয়ম্বদ প্রিয় মিত্রের নেত্রের বাহির হইয়া স্থিরচিত্তে দিন যামিনী যাপন করিতেছি? ও আমার নয়ন কি তাহার মোহন মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপরের অসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে? ও আমার শ্রবণ কি প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণ ও সুললিত শব্দবিন্যাস শ্রবণে প্রয়াস না করিয়া অপরের লালিত্যরহিত যৎসামান্য বক্তৃতা-রসে সুশীতল হইতেছে কোথায়? তাহারা সততই সন্তোষবিহীন হইয়া স্বীয়২ কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কট ভাবিতেছে, চিত্ত ভগ্ন, নেত্র নীরে মগ্ন, শ্রবণ বধির ন্যায় রহিয়াছে, একে বিধবা হইয়া পতিবিরহে দেহে সুখশূন্য হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে সময় সম্বরণ করিতেছি, তায় আবার আজি নিদারুণ একাদশী উপবাস-রূপ-অসি দেখাইয়া শরীর শুষ্ক করিতেছে, আমি কি বোন জীবনবিহীনে জীবন ধারণ ও আহার না করিয়া ক্ষুধা সম্বরণ করিতে সমর্থা হইতে পারি? আমার শরীরে কি এ কঠোররূপ একাদশীর উপবাস সহ্য হয়? প্রাণ যায় যায় আর বাঁচি না, শরীর শুষ্ক ও কম্পিত হইতেছে, ক্ষণে২ যেন চারি দিক্ শূন্য দেখিতেছি, এ অভাগিনীকে আর

কত কাল এরূপ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, ও একাদশীর উপবাসে কলেবর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবেক, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি তুর্দ্দশা না ঘটিল? বসন ভূষণে বর্জ্জিত হইয়াছি, বেশ ঘুচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, অবশেষ শেষ হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, জনক জননী যাঁহারা প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্রী করিয়া অপরির্য্যাপ্ত প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারা এক্ষণে হতভাগ্য ও পাপীয়সী ভিন্ন আর কোন সম্ভাষণই করেন না, শ্বশুর শাশুড়ী যাঁহারদের যতনের ধন ও কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধারস্বরূপ হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, তাঁহারদেরও এক্ষণে বিষদৃষ্টি হইয়াছি ও তাঁহারা রাক্ষসী বলিয়া আর মুখাবলোকনও করেন না, আহা! আর কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিবারও তো কোন উপায় দেখিতেছি না, লার্ড বেন্টিক ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সহমরণ নিবারণ করিয়া কি যোষিৎগণের বিহিত উপকার করিয়াছেন, না না আমার বিচারে তো তাঁহারদিগের এরূপ চিরস্মরণীয় মহৎ পুণ্যকে অশেষ ক্লেশকর ও দূষণাবহ বলিয়া বোধ হইতেছে, যদিস্যাৎ পতির লোকান্তে নারীগণের পক্ষে পতি পাইবার কোন উপায়ান্তর থাকিত তাহা হইলে উক্ত মহাত্মাগণের এই অনির্ব্বচনীয় করুণা ও কীর্ত্তির কতই শোভা প্রকাশ পাইত, পতির মৃত্যু হইলে বিধবা হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা সহমরণকে শতগুণে শ্রেয়স্কর বলিলে সম্ভব হইতে পারে; পতির সহিত সন্দর্শন হউক বা না হউক তাহাকে পাই বা না পাই যাবজ্জীবন তুঃখানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা এক দিবস দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিনাশ করা কতই ক্লেশকর বল?

অনুপমার এরূপ আক্ষেপ শুনিয়া গিরিজা নাম্নী কোন গুণবতী কহিলেন, অয়ি, সুশীলে! স্থির হও আর উতলা হইও না, বোধ করি এত দিনে আমারদিগের দুঃখের নিশি অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুখরূপ সূর্য্য আমারদিগের সৌভাগ্যরূপ গগনমণ্ডলে অচিরাৎ উদয় হইবেক, নগর পল্লী সকল স্থানে ও ঘরে পরে সর্ব্বত্রই এইরূপ জনরব হইতেছে, পতিহীনা মলিনা বিধবাগণের যন্ত্রণা নিবারণার্থে পরম করুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন, বোধ করি অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট সহমরণ রহিত করণের ন্যায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

অহং

দী

ইহার শেষ পত্রে প্রকাশ হইবে।

(সংবাদ প্রভাকর, সোমবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।
১৪ ফাল্গুন ১২৬২)*

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

[গত শুক্রবারের শেষ।]

ভগিনী! আর ভাবিও না আমারদিগের পক্ষে এ বড় কম পড়তা নয়, এ কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিল ঠিক লো ঠিক, এ জন্যই বুঝি বোন কাল আমার কর্ত্তাটি এরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন, "প্রিয়সী মনে রেখো, তোমারদের আর বার পায় কে? আজ কাল তোমারদের কচেবারো আর যুগ ভাঙ্গিতে হবে না বিধবাগণের বিবাহ হইবেক, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ কর তিনি তোমারদের সহজ উপকারক নন, এত দিনে

তোমাদের সিঁতের সিন্দুর ও হাতের লোহা অক্ষয় হইল” ইতি-মুখে এইরূপ কৌতুক শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহার মনোরঞ্জন ও সুশীলা স্বভাব প্রদর্শন জন্য বলিলাম ও মা কি ঘৃণা এ কেমন করিয়া হবে, আবার আমরা অন্য পুরুষের নিকট কি প্রকারে ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিব, কি লজ্জা মেয়ে হোয়ে কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে মনে২ করিলাম হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সৎযুক্তি সকল সঙ্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নাম্নী একটি বিধবা বলিলেন, যথার্থ বোন আমিও অনেক দিন শুনিয়াছি যে আমারদিগের শাকে বালী ঘুচিয়া দুগ্ধে চিনি হইবেক, কেবল লোকলজ্জায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই, প্রতিদিনই কপালে করাঘাৎচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি, কিন্তু বোন পা ফাটা মাথা চাঁচা পোড়াকপালে ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি আটকুড়রা যে পেছু ডাকিতেছে বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিণী বলিলেন না বোন ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয় পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা মাথা চাঁচা গায়ে কতকগুলা গঙ্গা মৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি! গোঁসাঞিদের বা কি ঢং ঠিক যেন অক্রূর দত্তের রাসের সং, গা-ময় তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী

আদালতের ফয়সালা বেরুলেন, তাঁহারদিগের কর্ম্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিয়া বিজয়ী হইতে পারে, বিবেচনা করিলে বোন আমারদিগের বড়ই সুখের সময় উপস্থিত।

পদ্য

মেয়েলী ছন্দঃ

এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো,
কবে হবে বল।
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো,
বিপক্ষের বল॥
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো,
এত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্ম্মের ফল, দিদী অধর্ম্মের ফল লো,
অধর্ম্মের ফল॥
বিবাদী হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো,
যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো,
সব যাবে তল॥
পরামর্শ করিয়াছে যত যুবা দল, দিদী যত যুবা দল লো,
যত যুবা দল।
ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল, দুটি নয়নের জল লো,
নয়নের জল॥
বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল, দিদী জুড়াবার স্থল লো,
জুড়াবার স্থল।
কতই হইব সুখী বিয়ে হোলে চল, দিদী বিয়ে হোলে চল লো,
বিয়ে হোলে চল॥

অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল, পোড়া লোকে
ধরে ছল লো, লোকে ধরে ছল।
অভয়ে পরিব পায়ে চারিগাছা মল, দিদী চারিগাছা মল লো,
চারিগাছা মল॥
অবলা সরলা অতি নাহি কোন বল, দিদী নাহি কোন বল লো,
নাহি কোন বল।
পতিরে পড়িলে মনে আঁখি ছল ছল, করে আঁখি ছল ছল লো,
আঁখি ছল ছল॥
কেন আর মন দুঃখে গৃহে চল চল, দিদী গৃহে চল চল লো,
গৃহে চল চল।
ঈশ্বরের পরামর্শে জানিবে অটল, দিদী জানিবে অটল লো,
জানিবে অটল॥
ধ্বক ধ্বক করে মনে সদা দুখানল, দিদী সদা দুখানল লো,
সদা দুখানল।
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদী বিবাহের জল লো,
বিবাহের জল॥

১০ ফাল্গুন
সন ১২৬২। অহং
শ্রীদী, * * *

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

১। নীল দর্পণং নাটকং। ইং ১৮৬০। পৃ. ৯০।

২। নবীন তপস্বিনী নাটক। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৫৭।

৩। বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো। এপ্রিল (?) ১৮৬৬।

৪। সধবার একাদশী। অক্টোবর (?) ১৮৬৬।

৫। লীলাবতী। ইং ১৮৬৭। পৃ. ১৯২।

৬। সুরধুনী কাব্য ঃ

১ম ভাগ। আগস্ট, ১৮৭১। পৃ ১২৪।

২য় ভাগ। ইং ১৮৭৬। পৃ. ৪৭।

৭। জামাই বারিক। মার্চ, ১৮৭২। পৃ. ৭৮।

৮। দ্বাদশ কবিতা। মে, ১৮৭২। পৃ. ৬৩।

৯। কমলে কামিনী নাটক। ইং ১৮৭৩। পৃ. ১৩৬।